সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০২২

স্বাগত
বাংলা নববর্ষ
১৪২৯

অসমে ’৭১-এর বীরদের সম্মাননায় রাজনাথ

২৫ এপ্রিল ২০২২ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং অসমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিন শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নারী-পুরুষের প্রতি জানানো এ সম্মাননা অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

উপরে

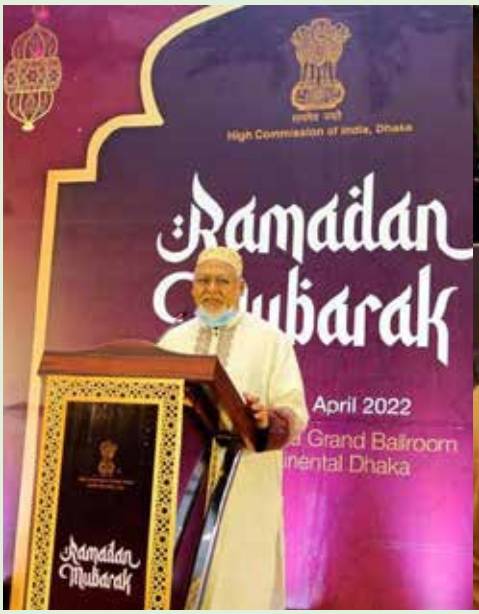

সবাইকে রমজান কারীম!

কোভিড-১৯-এর পর ভারতীয় হাই কমিশন আয়োজিত প্রথম ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রিত মন্ত্রী ও বিশিষ্টজনদের সমাবেশ

মিরসরাইয়ে মহিন্দ্রার অর্থনৈতিক জোন

২৬ এপ্রিল ২০২২ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম কে. দোরাইস্বামী ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মিরসরাইয়ে একটি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেজা ও মহিন্দ্রা কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের মধ্যে কনসালটেন্সি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫০ | সংখ্যা ০৪ | চৈত্র ১৪২৮-বৈশাখ ১৪২৯ | এপ্রিল ২০২২

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

সম্পাদক
নান্টু রায়
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: inf4.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই। এ পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

০৬-০৭ | কর্মযোগ
কেরানীগঞ্জে আইটি/হাই-টেক পার্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন
মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি প্রদান
ভারতীয় হাই কমিশনে সুবর্ণ জয়ন্তী বৃত্তি ওয়েবসাইট চালু
'বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন টু ইন্ডিয়া-২০২২'

০৮ | উন্নয়ন
গুজরাটে হু গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন উদ্বোধন
ভারতের গুজরাটের জামনগরে নতুন হু (ডব্লিউএইচও) গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসকে অভিনন্দন জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গান্ধীনগরে 'গ্লোবাল আয়ুষ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন' শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসকে 'তুলসীভাই' নামে আখ্যায়িত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

০৯-১৫ | প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
প্রসঙ্গ বাংলা নববর্ষ
ছয় ঋতুচক্রে বৈশাখ নির্ধারিত হয়েছে নববর্ষের আবির্ভাবরূপে। রুদ্র বৈশাখ তার তপ্ত চরণ রেখা ফেলে চরাচরে, কাল বৈশাখীর মত্ত ঝাপটা চরাচরকে করে তোলে ক্ষুব্ধ ও মাতাল, দারুণ দহনবেলা যেন ত্রাহি রবে হাহাকারে ভরিয়ে তোলে দিগন্ত; এই মহালগ্নই যেন নতুন বছরের আহ্বান জানিয়ে আমাদের বলে, এই আমি ঝরাপাতার আয়তন মাড়িয়ে এলাম তোমার দ্বারে, আমায় বরণ কর।...

১৬-১৭ | রসনাবিলাস

রসনায় বৈশাখ

পুরনোকে বিদায় জানিয়ে হৈ হৈ করে এসে পড়ল বাংলা নববর্ষ ১৪২৯। সঙ্গে নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং অবশ্যই বাঙালির চিরদিনের, চিরপ্রিয়– মাছ-মিষ্টি-চিকেন। তিন অভিবাসী বাঙালি বৈশাখের রসনাতৃপ্তির খবর দিয়েছেন...

১৮-২০ | নিবন্ধ

শঙ্খ ঘোষের ‘কবির অভিপ্রায়’

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি শঙ্খ ঘোষ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই পাঠকের শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু শিক্ষাদান করেন, শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষকতার সঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষের সরাসরি সম্পৃক্ততাও ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যবিষয় নিয়েও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর দ্বারস্থ হতেন। কবি শঙ্খ ঘোষের পেশা ছিল অধ্যাপনা। কবিতা ও কর্মের শঙ্খ বাজাতে বাজাতে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন কবিতা পিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী পাঠকগোষ্ঠীর শিক্ষাগুরু।

২১-২৩ | ছোটগল্প

ব্রহ্মপুত্রের ঘাট

খুব দূরেও নয়, আবার কাছেও বলা যাবে না। যাত্রাপথ সাকুল্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের। কোনও বিভ্রাট হলে প্লাস-মাইনাস পাঁচ থেকে দশ মিনিট। যাত্রার সময়ের মত পথের রেখাও ঝকঝকে, স্পষ্ট। কিশোরগঞ্জ থেকে নান্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ হয়ে ডানে গৌরীপুর, নেত্রকোনা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট রেখে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শম্ভুগঞ্জ ঘাট। ট্রেনে এলেও মোটামুটি একই সময় লাগে আর অভিন্ন জনপদগুলো পেরিয়ে আসতে হয়। পূর্ব ময়মনসিংহের এই চিরায়ত ভূগোলে সড়ক আর রেলপথ বলতে গেলে সমান্তরালে চলেছে।

২৪-২৫ | কবিতা

বাদল ঘোষ, গাফ্‌ফার মাহমুদ, মিতুল সাইফ, ভজন সরকার ও দুলাল সরকার

২৬-২৭ | ছোটগল্প

মতবাদের দায়

চেয়ারম্যান মাওকে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার জের-রেশ এখনও কাটেনি। এমনই দিনে আমার মত বামপন্থাকে আঁকড়ে খুব কম মানুষই আজকাল বাঁচছে এ দেশে। অন্তত আমার এমনটাই মনে হয়। তবু চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের নামে আমার জীবনটাও অনেকের মত তছনছ করা হয়েছিল একদিন। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হব। আমার মত শিক্ষার্থীদের সামনে চেয়ারম্যান মাও-কে ক'জন তুলে ধরতে পারতেন?

২৮-৩১ | নিবন্ধ

উৎপল দত্ত

শিশির-উত্তর বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিস্ময় ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ভিলেন ও কৌতুকাভিনেতা উৎপল দত্ত। বাংলা তথা ভারতের নাট্যসমাজের এক আশ্চর্য, তুলনাহীন ব্যক্তিত্বের নাম উৎপল দত্ত। তিনি যে কেবল নট, নাট্যকার, নির্দেশক, গবেষক, চিন্তাবিদ বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রচারক ছিলেন, তা নয়– তাঁর সবকিছুকে নিয়ে ভারতীয় নাট্যজগতে যে বিপুল আলোড়ন উঠেছিল, তাঁর সময়কালে আর কোনও নাট্যব্যক্তিত্বকে ঘিরে তেমনটা হয়নি। তাঁর মত আগে কেউ ছিলেন না, পরেও কেউ আসেননি। পুলিশি নির্যাতন, কারাবাস, দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর নাটকের উপর আক্রমণ... কোনও কিছুই থামাতে পারেনি সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত এই নাট্যব্যক্তিত্বকে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সিনেমা নয়, তাঁর আসল জাত চিনিয়েছে নাটক।

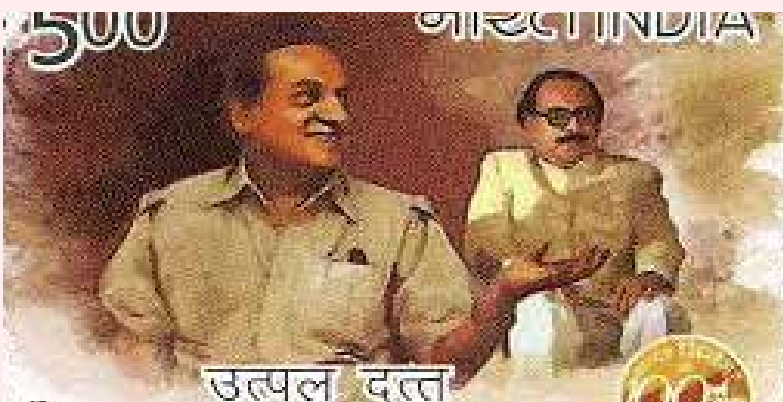

৩২-৩৫ ধারাবাহিক

রেড পার্সেন্টেজ

রেড পার্সেন্টেজ একটি রহস্য উপন্যাস। কোভিডকালে অসংখ্য মানুষের চাকরি চলে যায়। এই সব বেকার ছেলেরা হাতের সামনে যা পায়, তাই নিয়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে তখন। এদের ভেতর একটা বড় অংশ যুক্ত হয় ক্যুরিয়ের সার্ভিসে। পিঠে একটা লজিস্টিক ব্যাগ চাপিয়ে সাইকেল বা বাইকে চেপে এরা খাবার বা যে কোনও অনলাইন প্রোডাক্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গজনী এরকম সার্ভিস নিয়ে নিজের অজ্ঞাতে বিপদে জড়িয়ে পড়ে। সে না জেনেই ব্যাগের ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা একটা শিশুকে পৌঁছে দিয়ে আসে ধান্যকুড়িয়ার এক বাড়িতে। জানাজানি হয়। শুরু হয় থানা পুলিশ। ধান্যকুড়িয়ার ইতিহাসের অধ্যাপিকা উজ্জয়িনী ইতিহাসের খুঁটিনাটি দেখার চোখ দিয়ে চোরা চালান রহস্যেরই উন্মোচন করে...

৩৬-৩৯ কেন্দ্রবিন্দু

হরিয়ানা

ভারতের উত্তর-কেন্দ্রীয় রাজ্য হরিয়ানার উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব ও কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড চণ্ডিগড়, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড, পূর্বে উত্তর প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড দিল্লি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে রাজস্থান অবস্থিত। কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডিগড় শহর শুধু কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডটির রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, এটি হরিয়ানা ও পঞ্জাবেরও রাজধানী। ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর ভাষার ভিত্তিতে সাবেক পঞ্জাব দু'ভাগে বিভক্ত হয়, পঞ্জাবিভাষী পঞ্জাব ও হিন্দিভাষী হরিয়ানা। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্জাবি সুবা গঠনের দাবি এবং পরবর্তীকালে পঞ্জাবের হিন্দিভাষী মানুষের বিশাল হরিয়ানা রাজ্য গঠনের স্বপ্নের প্রেক্ষিতে এ রাজ্য পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়।

৪০-৪১ হেঁসেলঘর

হরিয়ানার ১৭ নিজস্ব খাবার

হরিয়ানা ভারতের অন্যতম ধনী রাজ্য যার মানুষেরা বিনয়ী ও দয়ালু। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বৃত্তি কৃষি, গো-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন। হরিয়ানভীদের খাদ্য নিরামিষ– এতে প্রচুর দুধ-ঘির ব্যবহার থাকে। হরিয়ানাকে 'ল্যান্ড অফ রুটি' নামেও অভিহিত করা হয়। এবার হরিয়ানার ১৭টি নিজস্ব পদের তালিকা সন্নিবেশিত হল...

৪২-৪৩ চলচ্চিত্র

সময়ের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন মহানায়িকা

ষাট-সত্তরের দশকে রূপোলি পর্দায় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। অথচ খ্যাতির শিখরে থাকাকালীন আচমকাই একদিন স্বেচ্ছায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। কারণটা আজও অজানা। তবে অন্তরালে চলে গেলেও চর্চায় তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেনও। কারণ তিনি যে সুচিত্রা সেন! বাংলা ছবির জগতের এক সময়ের অধিশ্বরী! গ্ল্যামার কুইন! মহানায়িকা। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, প্রখর সম্ভ্রম আর দাপুটে অভিনয়– এই সবকিছু দিয়ে সুচিত্রা সেন জিতে নিয়েছিলেন প্রতিটা বাঙালির মন। ভীষণ ভার্সেটাইল ছিলেন তিনি। একদিকে স্নিগ্ধ আবার অন্যদিকে দৃঢ়। আর তাঁর সেই ভীষণরকম বাঙ্ময় দু'টো চোখ আর গভীর চাহনি, যার জন্য উথালপাথাল হত প্রত্যেকটা বাঙালির মন! আজও একইভাবে বাঙালির ইমোশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন মহানায়িকা। অভিনয় জগতেই কি শুধু তাঁর অবদান? তা কিন্তু নয়! অভিনয় জগতের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশন দুনিয়াতেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর ফ্যাশন সেন্স আর স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে আজও চর্চা হয়। এমনকি সুচিত্রা সেনের তৈরি ফ্যাশন ট্রেন্ড আজও আমরা ফলো করে চলেছি।

৪৪ ▌উন্নয়ন

গোবর-ধন ॥ আবর্জনা থেকে সম্পদ

আবর্জনা শুধুমাত্র পরিবেশের দূষণ ঘটায় না, স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। শুধু তাই নয়, আবর্জনা জমা হলে সেই জায়গায় অন্য কাজও করা যায় না। এইসব সমস্যা সমাধান করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সূচনা করেন। সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন শহরাঞ্চল ২.০ চালু হয়েছে। এর লক্ষ্য হল 'বর্জ্যমুক্ত শহর' তৈরি করার একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা। এই মিশনের মাধ্যমে শহরগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্যমুক্ত করা হবে, শহরগুলোর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় ধরে দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল।

৪৫-৪৬ ▌মনীষী

বি আর আম্বেদকর

মানুষকে দাস বানিয়ে অনেকেই সম্রাট হয়েছে, কিন্তু আজ আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানব, যিনি সাধারণ মানুষকে দাসত্বের বাঁধন ছিন্ন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। সাম্যের প্রতীক ভারতরত্ন ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচনা করেন। তিনি দলিত ও অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। বি আর আম্বেদকর বলতেন, 'আমি এমন ধর্মকে মানি যে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়।' কিন্তু সারা দেশের জন্য অনেক মহৎ কর্ম করা এই লোকটি তার জীবনের প্রথমদিকে সমাজের দ্বারা যে পরিমাণ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়েছেন তা মনে হয় না অন্য কেউ হয়েছেন, এবং সেই সমস্ত অপমান ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম হয় ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলায় মৌ-এ।

৪৭ ▌ভারতবিষয়ক কুইজ

আচ্ছা, বলুন তো?

৪৮ ▌শেষ পাতা

ছায়াবাদের 'মীরা' মহাদেবী বর্মা

হিন্দি সাহিত্যের মহান সুপরিচিত কবি ও লেখক মহাদেবী বর্মা তাঁর রচনায়-কাব্যে-গদ্যে শব্দের ব্যবহার এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল রচনার গঠন-কাঠামো। তিনি আধুনিক হিন্দি কাব্যধারার 'ছায়াবাদ' ঘরানার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, সেই কারণে তাঁকে ছায়াবাদের 'মীরা'ও বলা হত। যদিও তিনি ছায়াবাদ ঘরানায় সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, জয়শঙ্কর প্রসাদ ও সুমিত্রানন্দন পন্তের চেয়ে অনেক পরে এসেছেন, তবে তাঁর লেখার ধরন ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। তাঁর কবিতায় রহস্য ছিল, ছিল অজানার প্রতি আভাস। তাঁর রচনায় দুঃখ ও ভালবাসা এমনভাবে মিশে আছে যা আলাদা করা যায় না। তাঁর রচিত কবিতা ও গদ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মেরা পরিবার, স্মৃতি কি রেখাঁ, পথ কে সাথী ও অতীত কে চলচ্চিত্র।

আনন্দের উৎসব রঙের উৎসব হোলির দিনে ১৯০৭ সালের ২৬ মার্চ হোলির দিনে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাত সন্তানের পর এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। পিতামহ বঙ্কুবিহারী গৃহদেবতার নামে নাতনির নামকরণ করেন মহাদেবী। তাঁর বাবা গোবিন্দপ্রসাদ বর্মা ছিলেন ভাগলপুরের একটি কলেজের অধ্যক্ষ। মা হেমরানি দেবী ছিলেন গৃহবধূ। মহাদেবীর সাত বছর বয়সে একদিন কিছু লিখছেন দেখে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী লিখছ তুমি?' মহাদেবী উত্তর দিলেন, 'আমি কবিতা লিখছি।' মহাদেবী তাঁর বাবাকে কবিতাটি পড়ে শোনান।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় বর্ষগণনায় বছর হল সৌর-পদ্ধতির, কিন্তু মাসগুলো চান্দ্র। আকবর চেয়েছিলেন মাসগুলোকেও সৌর পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে। চান্দ্রমাসকে সৌর বৎসরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ভারতের জ্যোতির্বিদরা মলমাসের নিদান রেখেছিলেন। তাতে বছরের হিসেব শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ দিনেই দাঁড়ায়। কিন্তু আকবর নতুন 'ইলাহী সাল'-এ বাংলা মাসগুলো পারস্য দেশীয় মাসের অনুকরণে সৌরমাসে পরিণত করলেন। আকবর-প্রবর্তিত নতুন বাংলা সনকে আদিতে তাঁর প্রবর্তিত 'দীন-ই ইলাহী' ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'ইলাহি সাল' বলা হত। একে নামান্তরে বলা হয় 'ফসলি সাল', যার সূচনা ৯৬৩ হিজরি। অর্থাৎ বাংলা সনকে ইসলামি সনের সঙ্গে এক করে দেয়া হল। সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের এক মাস পরের তারিখ থেকে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল ১৫৫৬ থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা। খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে তাহলে বাংলা সনের সম্পর্কটা দাঁড়াল কীরকম? খ্রিস্টীয় সন থেকে বাংলা সন ৫৯৩ বছর ৩ মাস ১১ দিন কম। আজ পর্যন্ত তা বহাল আছে। কিন্তু ৯৬৩ হিজরি বাংলা ৯৬৩ সন হলেও আজকের হিসেবটা অন্যরকম। এ বছর বাংলা ১৪২৯, কিন্তু হিজরি ১৪৪৪। কেন এমন পার্থক্য? কারণ হিজরি বছর চান্দ্রমাস অনুযায়ী হয় বলে ৩৫৪ দিনে বছর হয়। আকবরের কল্যাণে আমরা একদিকে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ পেলাম, অন্যদিকে পেলাম ইংরেজি গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সাযুজ্য।

আকবর-প্রবর্তিত বাংলা সন যে দ্রুত জনপ্রিয় এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যপ্রণেতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গল কাব্যেই পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে এ কাব্য। কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা শুরু হয়েছে বৈশাখের বিড়ম্বিত জীবন দিয়ে– 'ভ্যারেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।/ প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥/ বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।/ তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥/ পা পোড়ায় খরতর রাবির কিরণ।/ শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন ॥/ বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।/ মাংস নাহি খায়-সর্ব্বলোক নিরামিষ ॥

বাংলা নববর্ষ নিয়ে ইদানীং মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে। এই দুই দেশে দুটি বিভিন্ন দিনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ ইংরেজি ১৪ই এপ্রিল তারিখটিকে বাংলা নববর্ষের ধ্রুব তারিখ করে নিয়েছে। বাংলা একাডেমি সংশোধিত সনের দিন ও মাসপঞ্জী নিম্নরূপ: বৈশাখ থেকে ভাদ্র, এই পাঁচ মাস হবে ৩১ দিনের। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাসগুলো হবে ৩০ দিনের। আর চৈত্রমাস সাধারণভাবে ৩০ দিনের হলেও চার বছর পরপর অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) হিসেবে ৩১ দিনের হবে। এই অধিবর্ষ হল বাংলা বর্ষপঞ্জীতে নতুন সংযোজন। এইভাবে বাংলা সনকে সৌর বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। এটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু ভারতবর্ষে এভাবে পঞ্জিকা সংশোধন ঘটেনি। ফলে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাসগুলো অসমান। কোনওটি ৩২ দিনের, ৩০ দিন কোনওটি, আবার ২৯ দিন। দু'দেশের নববর্ষ এক বা দু'দিনের আগে-পরে হয়ে যাচ্ছে।

ভারতে যে সনাতন পদ্ধতির বাংলা বর্ষপঞ্জিকা, যে-কোনও মানুষের পক্ষে তার হিসেব রাখা কঠিন। সুধিজনেরা এগিয়ে আসুন– একটা সর্বজনগ্রাহী বর্ষপঞ্জি উপহার দিন।

কেরানীগঞ্জে আইটি/হাই-টেক পার্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

১২ এপ্রিল ২০২২ ঢাকার কেরাণীগঞ্জে আইটি/হাই-টেক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ। ভারতের হাইকমিশনার শ্রী বিক্রমকুমার দোরাইস্বামী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

ফলক উন্মোচনের পর সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চারা রোপণ করেন। কেরানীগঞ্জের এই আইটি/হাই-টেক পার্কটি আরও বারোটি আইটি/হাই-টেক পার্কের একটি যা বাংলাদেশকে দেওয়া ভারত সরকারের লাইন অফ ক্রেডিট অর্থায়নে নির্মিত।

ভারতের হাই কমিশনার বলেন যে, প্রকল্পের মূল্য ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ শুধু ভারতের বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগী অংশীদার নয়, এই ১২টি আইটি/হাই-টেক পার্ক প্রকল্পটি বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরের বৃহত্তম প্রকল্পও। প্রকল্পটি আইসিটি সেক্টরে ভারত-বাংলাদেশের সহযোগিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশে আইটি/আইটিইএস শিল্পের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, স্ট্যান্ডার্ড আইটি/আইটিইএস/বিপিও হাব প্রতিষ্ঠা করা এবং ইন্টারনেট অফ থিংস, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বর্ধিত বাস্তবতা এবং অন্যান্য উন্নত বিষয়ের মত নতুন এবং উদীয়মান প্রযুক্তিতে সক্ষমতা তৈরি করা। একটি দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করবে যা বৃহত্তর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখবে।

এই ১২টি আইটি/হাই-টেক পার্ক গ্রীন বিল্ডিংয়ে নির্মিত হবে, যা হবে শক্তি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা থেকে নকশাটির প্রেরণা এসেছে।

মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি প্রদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার প্রতি বছর মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি প্রদান করে। এ বছর ১,৪৯৭ জন শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পাচ্ছেন।

ভারত সরকার ২০০৬ সালে মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের জন্য 'মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তি প্রকল্প' শুরু করে। প্রাথমিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক

ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর ২৪ হাজার টাকা করে চার বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ১০ হাজার টাকা করে দুই বছর বৃত্তি দেয়া হয়। এমনকি কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের ধারাবাহিকতায় এই বৃত্তি অব্যাহত ছিল। এটি বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণ ও সরকারের সাথে বন্ধুত্বের প্রতি ভারতের সরকার ও জনগণের চিরস্থায়ী অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে বর্তমান বৃত্তি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। নতুন বৃত্তি প্রকল্পের অধীনে পরবর্তী পাঁচ বছরে ১০ হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ২০ হাজার টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৫০ হাজার টাকা করে বৃত্তির পরিমাণ ধার্য করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৯ হাজার ৮২ জন শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছে এবং এপর্যন্ত ৪৪ কোটি ৯৯ লাখ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায়, ভারত সরকার ২০২২-২৩ থেকে আরও পাঁচ বছরের জন্য বৃত্তি প্রকল্পটি নবায়ন করে।

এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের মোট ১,৪৯৭ জন শিক্ষার্থী (৫০১ জন উচ্চ মাধ্যমিক ও ৯৯৬ জন স্নাতক পর্যায়ের) এই প্রকল্পের আওতায় বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সকল জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে।

ভারতীয় হাই কমিশনে সুবর্ণ জয়ন্তী বৃত্তি ওয়েবসাইট চালু

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে সুবর্ণ জয়ন্তী বৃত্তি ওয়েবসাইট চালু করেছে। ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীর আমন্ত্রণে বিশিষ্ট আইসিসিআর স্কলার এবং আইটিইসির প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভারতে শিক্ষা ও পেশাদারিত্বের সুযোগসমূহ ভাগ করে নেয়ার আহ্বান জানান। এরই আলোকে, ২০২১ সালের ২৬-২৭ মার্চ তাঁর বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের জন্য এক হাজার সুবর্ণ জয়ন্তী বৃত্তি (আইসিসিআর: ৫০০ আসন, আইটিইসি: ৫০০ আসন) ঘোষণা করা হয়। এই বৃত্তিগুলোর লক্ষ ছিল সেরা ও উজ্জ্বল প্রতিভাদের আকৃষ্ট করা এবং ভারতের নতুন শিক্ষানীতির অধীনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা। এই লক্ষ্য পূরণে এই বৃত্তির জন্য একটি নিবেদিত ওয়েব পোর্টাল: https://www.sjsdhaka.gov.in/ আজ জনসাধারণের জন্য আজ উন্মুক্ত করা হয়েছে। এসজেএস ওয়েবসাইটটি আবেদনকারীদের আইসিসিআর ও আইটিইসি উভয় সাইটেই পথ নির্দেশনা দেবে।

১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করার জন্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর) বৃত্তি চালু করেন।

ভারতীয় কারগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (আইটিইসি) কর্মসূচিটি ১৯৬৪ সালে চালু করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে পেশাদারদের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা।

গত বছর, অর্থাৎ ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ভারতের আইআইটি, এনআইটি, নালসার, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল, বিজ্ঞান, কলা, আইন, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি স্তরে ২৬৭টি আইসিসিআর বৃত্তি পেয়েছিলেন। মহামারীর কারণে কোনও সরাসরি কোর্স অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ২৮৫ জন বাংলাদেশি পেশাজীবী ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-আইটিইসি কোর্সের জন্য নথিভুক্ত করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন ২০২২

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিগত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ও প্রতিশ্রুতিশীল ১০০ তরুণ-তরুণীকে ভারতের রাজধানী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে। 'বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন টু ইন্ডিয়া' শীর্ষক 'একখণ্ড বিশ্ব' দেখার সুযোগ ২০১৯ সালের পর বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর ছোবলে স্থগিত হয়ে যায়। টানা দু'বছর পর এবার ২০২২ সালে পুনরায় এ বর্ণাঢ্য ও মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন শুরু হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন ২০২২-এর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ-তরুণীদের নির্বাচনের কাজ মে ২০২২ নাগাদ শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে এ বছর তরুণ-তরুণীরা দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে ভারত ভ্রমণের এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবেন। তারা ভারতের বিভিন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ পাবেন। BYD বা 'বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন ২০২২' প্রোগ্রাম বাংলাদেশের ১০০ জন প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীর এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে তারা ভারত ভ্রমণের অভাবিত সুযোগ পাবেন। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ নয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশের ১০০ জন প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীকে নির্বাচিত করা হবে। আপনি যদি মনে করেন, আপনি সেরা ১০০ জনের মধ্যে একজন হবার যোগ্য, তাহলে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিন। ফেসবুকে সার্চ করুন Bangladesh Youth Delegation। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ঢাকার ফেসবুক পেইজে।

বামে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীনগরে

উন্নয়ন

গুজরাটে হু গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন উদ্বোধন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান মোদীর মুখে 'তুলসীভাই'

গুজরাতিতে ২০ এপ্রিল ২০২২ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেম ছো... মাজামা?' আর ২১ এপ্রিল তাঁর গুজরাতি নামকরণ হল তুলসীভাই। গুজরাতের গান্ধীনগরে 'গ্লোবাল আয়ুষ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন' শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু–ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসকে 'তুলসীভাই' নামে আখ্যায়িত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন তাঁর নাম 'তুলসীভাই' রাখেন, তার ব্যাখ্যাও দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল আমার ভাল বন্ধু। তিনি আমাকে সবসময় বলেন, ভারতীয় শিক্ষকেরা আমাকে পড়িয়েছেন। আমার জীবনে ওই শিক্ষকদের ভূমিকা অসামান্য। আজ উনি আমাকে বললেন, 'আমি পাক্কা গুজরাতি হয়ে গিয়েছি! আমার কোনও নাম ঠিক করলেন?' তাই মহাত্মা গান্ধীর এই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার প্রিয় বন্ধুর গুজরাতিতে নাম রাখছি তুলসীভাই।'

গেব্রিয়েসাসের নতুন নামকরণ করে তুলসী গাছের মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তুলসী সেই গাছ, যাকে বর্তমান প্রজন্ম কার্যত ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাড়ির সামনে তুলসী গাছ লাগানো এবং তার পুজো করা একটা পরম্পরা ছিল। তুলসী সেই গাছ যা ভারতে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত। ১৯ এপ্রিল হু প্রধান 'কেম ছো' বলে বক্তৃতা শুরু করার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী যখন গেব্রিয়েসাসের নতুন নাম ঘোষণা করেন, তখন করতালিতে মুখর গোটা অনুষ্ঠানগৃহ। আপ্লুত হু-প্রধানও। পরে নিজের বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমি সৌভাগ্যবান, কারণ মহাত্মা গান্ধীর দেশে আসতে পেরেছি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের গুজরাটের জামনগরে নতুন হু (ডব্লিউএইচও) গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসকে অভিনন্দন জানান এবং ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্যসেবায় স্থায়িত্ব, সমতা এবং উদ্ভাবনে নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মিটিংয়ে তাঁর বক্তৃতায় আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতে স্থাপিত এই কেন্দ্র গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল হেলথ কেয়ার-এর জন্য একটি প্রমাণ-ভিত্তিক কেন্দ্রস্থল হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথ চিকিৎসা গবেষণার পথ উন্মুক্ত করবে।

তিনি কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই ও ব্যাপক টীকাকরণের প্রশংসা করে বলেন, 'বাংলাদেশ একইভাবে কোভিড মহামারী সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছে।'

ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের জন্য গ্লোবাল সেন্টার বিশ্বব্যাপী সুস্থতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে যা ঐতিহ্যগত ওষুধের সাথে সম্পর্কিত ওষুধ ও গবেষণার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

প্রসঙ্গ বাংলা নববর্ষ

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

‘রাত্র যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লিঝঙ্কারসুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।’
– রবীন্দ্রনাথ। ‘বর্ষশেষ’, ধর্মগ্রন্থ থেকে।

নতুন বছরের আগমনীকে এরকম দৃষ্টিতেই দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানেও রয়েছে বাংলা নববর্ষের অনুরূপ গূঢ় বার্তা, ‘যে মালা নিলে না আমার ফাগুনে/ জ্বালাব তারে তব রূপের আগুনে/ মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব হে/ মোর উদাসীন, যেও না ফেলে।’

ছয় ঋতুচক্রে বৈশাখ নির্ধারিত হয়েছে নববর্ষের আবির্ভাবরূপে। রুদ্র বৈশাখ তার তপ্ত চরণ রেখা ফেলে চরাচরে, কাল বৈশাখীর মত্ত ঝাপটা চরাচরকে করে তোলে ক্ষুব্ধ ও মাতাল, দারুণ দহনবেলা যেন ত্রাহি রবে হাহাকারে ভরিয়ে তোলে দিগন্ত; এই মহালগ্নই যেন নতুন বছরের আহ্বান জানিয়ে আমাদের বলে, এই আমি ঝরাপাতার আয়তন মাড়িয়ে এলাম তোমার দ্বারে, আমায় বরণ কর। আম্রমুকুলের গন্ধ অতিক্রান্ত পৃথিবীতে আমি ফুটিয়েছি কত পুষ্প কত ফল, এসবের স্বাদে ও গন্ধে আনন্দিত আহ্লাদিত হয়ে ওঠ। বৎসরের আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাক, অশ্রুবাষ্পকে সুদূরে মিলাতে দাও। অগ্নিস্নানে ধরণী শুচি হোক, ‘পুরাতন বরষের সাথে/ পুরাতন অপরাধ যত’, তা হয়ে উঠুক ক্ষমার্হ।

নতুন বছর যেন প্রাণের উৎসব, নিজেকে নতুন করে নতুন উদ্যোগে জাগিয়ে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় নববর্ষ পালনের দেশীয় ঐতিহ্যজাত আবাহনী। ভারতবর্ষে, মিশরে, ইউরোপে, আমেরিকার দেশে দেশে।

নববর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি-বার্ষিক গতির হিসেব ও সালতামামি। প্রাচীন পৃথিবীতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রাগ্রসরতা লক্ষ করি যে-সব দেশে, সেগুলোর মধ্যে মিশর, মোসোপটেমিয়া এবং ভারত অন্যতম। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, নীল নদ আর সিন্ধু-গঙ্গার বাৎসরিক নদীচারিত্র্যের বৈশিষ্ট্য ও নিশ্ছিদ্র ছন্দ কৃষকের চাষবাসকে

পরিচালনা করতে ভূমিকা রাখত। হ্যাঁ, চিনের হোয়াংহো নদীর বার্ষিক আবর্তনও কৃষিকাজে সহায়ক ভূমিকা রাখত। এই যে নৈসর্গিক নদীর ছন্দ, তার ফলেই কৃষি, তার জন্যেই সভ্যতা, জাতীয় পর্ব, ধর্মানুষ্ঠান। সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে কৃষিনির্ভর সভ্যতার হাত ধরে। নদীর জোয়ার-ভাটা তাকে উৎসুক ও উদগ্রীব করে তুলল পূর্ণিমা-অমাবস্যার রহস্যমোচনে। বর্ষার গুরুত্ব যেহেতু কৃষিকাজে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আদিম মানুষ ঋতুপর্যায় সবিশেষ অনুধাবনে তৎপর হল। শুরু হল বর্ষপঞ্জি রচনা। প্রাথমিক উদ্দেশ্য কৃষিকাজকে সহায়ক করে তোলা। আর পরবর্তী উদ্দেশ্য জাতিবিশেষের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সংস্কৃতির যৌগে বাঁধা। সেই অভিপ্রায়ের সূত্র ধরেই নববর্ষের ধ্যান ও ধারণা মানুষের। এবং আদিতে তা ফসল ঘরে তোলার আনন্দ উৎসবকে শিরোধার্য করেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

মনুষ্য সভ্যতার আদি থেকেই দেখা যায়, যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের পেছনে ফসল ঘরে তোলার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তারপর মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনাবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের মত জ্যোতির্বিদ্যা মানুষকে গ্রহনক্ষত্রের গতি ও কার্যক্রম জানতে শেখাল। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিকগতি সম্পর্কে অবহিতি ঋতুসমূহের আবর্তন-পুনরাবর্তনের ব্যাখ্যা দিল, আর এর ফলেই গ্রন্থিত হল পঞ্জিকা। উৎসব-অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট এল এরই হাত ধরেই। এল নববর্ষের ধারণাও। দেখা যাচ্ছে, দেশে দেশে নববর্ষ পালন মূলত সৌরজগতের গ্রহণক্ষত্রের সংস্থান মেনেই পালিত হয় এবং যুগপৎ এর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে কৃষিজ ফলন।

আমরা প্রাথমিকভাবে বাংলা নববর্ষ নিয়েই আলোচনা করব, যদিও এর পাশাপাশি ভারতবর্ষ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে নববর্ষ পালনের তাৎপর্য, ধারাবাহিকতা ও বৈশিষ্ট্য- বৈচিত্র্য নিয়েও অনুসন্ধিৎসু হব।

বাংলা নববর্ষ

ভারতবর্ষে নববর্ষ পালনের বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে। বাঙালির নববর্ষ পালনও বৈচিত্র্যময়। নববর্ষ এবং অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠান আর সামাজিক-ধর্মীয় বিধিনিষেধ বিধৃত হয় যে পঞ্জিকায়, অঞ্চলভেদে তারই তো সংখ্যা প্রায় অনির্ণেয়। এদেশে কমবেশি চল্লিশ রকম পাঁজির ব্যবহার ও প্রচলন। এর মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকার শরণাপন্ন হয় হিন্দু বাঙালির বৃহদংশ। পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। এই পঞ্চাঙ্গেরও রকমফের আছে, গুপ্ত প্রেস এক বলে তো বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত অন্য, আবার জগজ্জ্যোতির সঙ্গে পি এম বাগচীর সর্বদা মিল হয় না। তবে এ-সব পঞ্জিকা ১লা বৈশাখকেই নববর্ষরূপে মান্য করে। যদিও অতীতে বৈশাখ নয়, নববর্ষ হত অগ্রহায়ণে। কেন এবং কখন থেকে এই পরিবর্তন?

পুরনো বাংলা ছড়াতে দেখি অগ্রহায়ণে বর্ষ শুরুর সমর্থন, ' অঘ্রানেতে বছর শুরু নবান্ন হয় মিঠে।/ পৌষেতে আউলি বাউলি ঘরে ঘরে পিঠে। বর্ষ শেষ হত কার্তিক মাসে। এজন্য বাংলার মেয়েদের কার্তিকে পিত্রালয়ে না যাওয়ার বিধান ছিল, – 'কার্তিক মাস বছরের শেষ, না যেও পিতার দেশ।'

আবার বৈদিক আমলে সম্বৎসরের গোড়ায় রয়েছে মধুমাস, অর্থাৎ বসন্তকাল। সে-যুগে মাসগুলোর নাম ছিল মধু, মাধব (বসন্ত), শুক্র, শুচি (গ্রীষ্ম), নভঃ, নভস্য (বর্ষা), ইষ, ঊর্জ (শরৎ), সহঃ, সহস্য (হেমন্ত) তপঃ, তপস্য (শীত)। ষড়ঋতু বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষযোগ্য ছিল ভারতবর্ষে। প্রাচীন ভারতে যে শকাব্দ, সেখানেও ১লা চৈত্র থেকে নববর্ষের সূচনা। আমরা পরে দেখব, ভারতের বহুস্থানে আজও ১লা চৈত্রকেই নববর্ষরূপে গণ্য করা হয়।

বরাহমিহিরের সূর্য সিদ্ধান্ত, আর্যভট্টের আর্ধরাত্রিকা, ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখান্দক হাজার বছরেরও পূর্বে পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রায় নির্ভুল নির্ধারণ করে দেখিয়েছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে ওমর খৈয়ামের মত গণিতজ্ঞ (হ্যাঁ, ইনিই আবার রুবাইয়াৎ-রচয়িতা) বার্ষিক গতির আরও অনুপুঙ্খ নির্ঘণ্ট বার করেন, যা পরবর্তীকালে কোপার্নিকাসের গণনার সঙ্গে মিলে যায়।

মেঘনাথ সাহা চৈত্র ও বৈশাখ মাসের দুই নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বরাহমিহির ও আর্যভট্টের গণনা ছিল প্রায় নির্ভুল, কিন্তু কিঞ্চিৎ ত্রুটিযুক্ত। বছরে ৩৬৫.০১৬৫৬ দিন করে এগিয়ে আছে হিসেব। তাই ১৪০০ বছরে ২৩.২ দিনে এগিয়ে এসে ১লা বৈশাখ ২২ শে মার্চ আরম্ভ না হয়ে ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল শুরু হচ্ছে। ড. সাহা তাঁর নবশকাব্দের তারিখ তাই পুনরায় ১লা চৈত্র থেকে শুরু করেছেন।

কিন্তু ১লা বৈশাখ নববর্ষ হল কেমন করে? কবে থেকেই বা? আমরা এখন সে-প্রসঙ্গেই যাব। পয়লা বৈশাখ থেকে নববর্ষ গণনার সূচনা আকবরের। ৯৬৩ হিজরি সনে সম্রাট আকবর দিল্লির মসনদে বসেন। বাংলাদেশ তখন মুঘলদের অধীনে। হিজরি সন হচ্ছে চান্দ্র বৎসর, ৩৫৪ দিনের। এতে করে খাজনা আদায় বিড়ম্বিত হয়, কেন-না হিজরি সনে ঋতুর বৈষম্য ঘটে যায়। তাই নির্দিষ্ট দিনে খাজনা আদায়ে অসুবিধে হয়। হিজরি সন অনুসরণ করলে নির্দিষ্ট মৌসুমে নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ অসম্ভব। সম্রাটের দরবারে কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে আকবর একটি নতুন সনের প্রবর্তনে আগ্রহী হন। সম্রাটের কাছেও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, বিশেষ করে খাজনা আদায়ের দিক থেকে বিচার করে।

এদিকে ভারতীয় বর্ষগণনার অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বছর হল সৌর-পদ্ধতির, কিন্তু মাসগুলো চান্দ্র। আকবর চেয়েছিলেন মাসগুলোকেও সৌর পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে। এখানেও উল্লেখযোগ্য, চান্দ্রমাসকে সৌর বৎসরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ভারতের জ্যোতির্বিদরা মলমাসের নিদান রেখেছিলেন। তাতে বছরের হিসেব শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ দিনেই দাঁড়ায়। কিন্তু আকবরের আদেশে বিজাপুরের সুলতানের প্রাক্তন সভাসদ আমীর উল্লাহ্ শিরাজী নতুন 'ইলাহী সাল'-এর বাংলা মাসগুলো পারস্য দেশীয় মাসের অনুকরণে সৌরমাসে পরিণত করলেন। আকবর-প্রবর্তিত নতুন বাংলা সনকে আদিতে 'ইলাহি সাল' বলা হত, তাঁর প্রবর্তিত 'দীন-ই ইলাহী' ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। একে নামান্তরে বলা হয় 'ফসলি সাল', যার সূচনা ৯৬৩ হিজরি। অর্থাৎ বাংলা সনকে ইসলামি সনের সঙ্গে এক করে দেয়া হল। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের এক মাস পরের তারিখ থেকে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল ১৫৫৬ থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা। খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে তাহলে বাংলা সনের সম্পর্কটা দাঁড়াল কীরকম? খ্রিস্টীয় সন থেকে বাংলা সন ৫৯৩ বছর ৩ মাস ১১ দিন কম। আজ পর্যন্ত তা বহাল আছে। কিন্তু ৯৬৩ হিজরি বাংলা ৯৬৩ সন হলেও আজকের হিসেবটা অন্যরকম। এ বছর বাংলা ১৪২৯, কিন্তু হিজরি ১৪৪৪। কেন এমন পার্থক্য? কারণ হিজরি বছর চান্দ্রমাস অনুযায়ী হয় বলে ৩৫৪ দিনে বছর হয়, ইসলামী বছর তাই এই প্রায় ৪৬২ বছরে দুটি ক্যালেন্ডারে ঘটে গিয়েছে ১৬ বছরের পার্থক্য! আকবরের কল্যাণে আমরা একদিকে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ পেলাম, অন্য দিকে পেলাম ইংরেজি গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সাযুজ্য।

আকবর-প্রবর্তিত বাংলা সন যে দ্রুত জনপ্রিয় এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যপ্রণেতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গল কাব্যেই পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে এ কাব্য। কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা শুরু হয়েছে বৈশাখের বিড়ম্বিত জীবন দিয়ে– 'ভ্যারেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।/ প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥/ বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।/ তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥/ পা পোড়ায় খরতর রাবির কিরণ।/ শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন ॥/ বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।/ মাংস নাহি খায়-সর্ব্বলোক নিরামিষ ॥'

পহেলা বৈশাখে বাঙালিজীবনে নববর্ষের রথ এগিয়ে চলেছে আজও– জীবনে এবং সাহিত্যে। তাই দেখি পথের পাঁচালীতে ইন্দির ঠাকরুন, যিনি কিনা 'বল্লালী বালাই', মারা যান বর্ষশুরুর দিন। আগের দিন দুর্গা তাকে চড়কের মেলাফেরৎ মুড়কি আর কদমা দিয়ে গেছে। ইন্দির আশীর্বাদও করেছে দুর্গাকে, 'রাজরানী হও।' আর পরদিনই মৃত্যু ইন্দিরের। ঘটনাটিকে ঐদিনে নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ, কেন-না 'ইন্দিরা ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।' অতএব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এইভাবে নববর্ষ নিয়ে এলেন লেখক। তবে পুরোপুরি সেকালের অবসান হয়নি নিশ্চিন্দিপুরের, কেন-না গ্রামে রয়েছেন আরও এক বৃদ্ধা, আতুরী বুড়ি। আতুরীর মৃত্যু চৈত্রসংক্রান্তিতে। এইভাবে যে মানুষের মৃত্যুকে ঋতুসংলগ্ন যুগসংলগ্ন করে দেখানো যায়, বিভূতিভূষণের উপন্যাসটি তার চমৎকার নিদর্শন।

বাংলা নববর্ষ নিয়ে ইদানীং মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে। এই দুই দেশে দুটি বিভিন্ন দিনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

হয়। বাংলাদেশ ইংরেজি ১৪ই এপ্রিল তারিখটিকে বাংলা নববর্ষের ধ্রুব তারিখ করে নিয়েছে। ১৯৫৮-য় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেখানকার বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বাংলা সনের সংস্কার সাধিত হয়। সেটি কার্যকর হয় ১৯৬৮ সাল থেকে। এই সংস্কার কাজে নেতৃত্ব দেন মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংশোধিত সনের দিন ও মাসপঞ্জী নিম্নরূপ: বৈশাখ থেকে ভাদ্র, এই পাঁচ মাস হবে ৩১ দিনের। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাসগুলো হবে ৩০ দিনের। আর চৈত্রমাস সাধারণভাবে ৩০ দিনের হলেও চার বছর পরপর অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) হিসেবে ৩১ দিনের হবে। এই অধিবর্ষ হল বাংলা বর্ষপঞ্জীতে নতুন সংযোজন। এইভাবে বাংলা সনকে সৌর বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। এটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু ভারতবর্ষে এভাবে পঞ্জিকা সংশোধন ঘটেনি। ফলে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাসগুলো অসমান। কোনটি ৩২ দিনের, ৩০ দিন কোনটি, আবার ২৯ দিন। দু'দেশের নববর্ষ এক বা দু'দিনের আগে-পরে হয়ে যাচ্ছে। বাংলা তারিখ অনুযায়ী যে অনুষ্ঠানগুলো পালিত হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যুদিন ২৫শে বৈশাখ এবং ২২শে শ্রাবণ; কাজী নজরুল ইসলামের

জন্ম ও মৃত্যুদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং ১২ই ভাদ্র; বাংলাদেশে ১লা আষাঢ় বর্ষাবরণের অনুষ্ঠান, ১লা অগ্রহায়ণ এবং ১লা ফাল্গুন যথাক্রমে নবান্ন ও বসন্তবন্দনা যে-দিনগুলোতে উদ্‌যাপিত হয়, বাংলা সে তারিখগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের তারিখ মেলে না। এই বিভ্রান্তি অচিরেই এড়ানো দরকার।

বিভ্রান্তি তো কেবল বাংলা সন নিয়েই নয়, আছে ইংরেজি বর্ষপঞ্জী নিয়েই। এই অবকাশে সেটা নিয়েও খানিক আলোচনা করা থাক। ভারতে আকবরের পঞ্জিকা সংস্কারের সমসাময়িককালে ১৫৮২-তে ইউরোপেও পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়। এটি করেছিলেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি। আজ পর্যন্ত এই ক্যালেন্ডারটি মান্যতা পেয়ে আসছে। ইউরোপ-আমেরিকা তো বটেই, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের রাজত্ব। এ ক্যালেন্ডারের প্রথম অসঙ্গতি হল, খ্রিস্ট-অব্দ ১ কিন্তু যিশুর আবির্ভাবের দিন নয়। হাস্যকর হলেও সত্যি, যিশুর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব চার (৪)-এ! আবার ইস্টারের কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। ২২শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ দিনের মধ্যে যে-কোন দিন হতে পারে। গ্রেগোরির আগে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৩৬৫ দিনের বর্ষপঞ্জী তৈরি করান। এর পেছনে কার্যকরী ছিল সিজারের মিশর জয়, মিশরীয়দের বর্ষপঞ্জী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল (তখন ইউরোপে ৩০৪ দিনের বৎসরব্যবস্থা চালু ছিল। মাসের সংখ্যা ছিল দশটি)। সিজারকে বর্ষসংস্কারে সাহায্য করেন মিশরের জ্যোতির্বিদ সোসিজেনিস (Sosigenes)। এই বর্ষগণনায় দশের জায়গায় বারো মাসের প্রবর্তন ঘটে। জুলাই মাসটি জুলিয়াস সিজারের নামে, আর সিজারের পরবর্তী সম্রাট অক্টোভিয়াস অগাস্টাসের নামে আগস্ট নাম চিহ্নিত হয়। ১৭৫২ সাল লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার গৃহীত হতে, তা-ও আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল এ জন্য। ভারতে ব্রিটিশ আমলের সূচনা থেকেই গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন।

গ্রেগোরিপঞ্জিতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, যেমন ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে, অন্য মাস কখনো ৩০ আর কখনো ৩১ দিনে, এর অবৈজ্ঞানিকতা পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিদদের কাছে ধরা পড়ে। বিশেষ করে এই ক্যালেন্ডার খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের পর্বতারিখগুলোকে প্রচণ্ডরকম বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গুড ফ্রাইডে, পাম সানডে, ক্র্যাশ ওয়েডনেসডে, লো সানডে প্রভৃতি তাই একেবারেই তারিখনির্ভর থাকতে পারছে না। এসব ত্রুটি দূর করবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) একটি বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা করেছিল, যা কার্যকর করা যায়নি।

পরিকল্পনাটি নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক। এদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্বৎসরের মেয়াদ ৩৬৫.২৫ দিন হলেও বছরের ৩৬৫তম দিন 'বর্ষশেষ দিন' বলে ধার্য হবে, অর্থাৎ সেটি কোন নির্দিষ্ট বার-নামধারী হবে না। তাহলে প্রত্যেক বছরের প্রতিটি তারিখ এক-ই বারের আওতায় এসে যাবে। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি রোববার গেছে। সেই অনুযায়ী বছরের শেষ দিনটি, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বরটি হবে রোববার। কিন্তু দিনটিকে রোববার আখ্যা না দিয়ে 'বর্ষশেষ দিন'রূপে আখ্যা দিলে পরের বছরও পয়লা জানুয়ারি রোববার-ই হবে। তাহলে ইংরেজি তারিখের সঙ্গে বারের একটা চিরস্থায়ী ঐক্য নিয়ে আসা যায়। কেবল অধিবর্ষ বা লিপইয়ার জুন মাসের ৩০-এর পরদিন করা হবে এবং সে দিনটিও যদি বারহীন হয়, তাহলে লিপ ইয়ারের সমস্যাও মেটে। আসলে সৌরবৎসরের সঙ্গে মাস

ও বারের গোড়া থেকেই অসামঞ্জস্য। এই অসঙ্গতি দূর করার যথাযথ উপায় বার করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্যোগ। এটি অবশ্যই জটিলতামুক্ত সর্বজনগ্রাহ্য বর্ষপঞ্জী হতে পারত।

এ-বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে বছরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা। প্রত্যেক ভাগের যে তিনটি করে মাস, তা হবে ৩১, ৩০ ও ৩০, এই মোট ৯১ দিনের। অর্থাৎ জানুয়ারি ৩১, আর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ৩০ দিনের এ রকম। তাহলে জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই আর অক্টোবর মাসের আরম্ভ এক-ই বারে হওয়া সম্ভব। সে রকম ফেব্রুয়ারি, মে, আগস্ট আর নভেম্বর এক-ই বারে, এবং মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের সূচনাও একই বারে ফেলা যায়। এমন সপ্তাহ-মাস-বৎসর সাযুজ্য সত্যিই গ্রহণযোগ্য হতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রচুর দেশের আপত্তি এতে। অতএব...

আমরা এখন বাংলা নববর্ষের অপরূপতায় ফিরে যাই আবার। দেখি কী তার মঙ্গল সমাচার। ভারতে সনাতন পদ্ধতির বাংলা বর্ষপঞ্জিকার একটা সর্বজনগ্রাহী হিসেব থাকা জরুরি।

বসে, আহার করে। জমিদার ও প্রজার প্রকৃত মিলনক্ষেত্রে পরিণত করলেন দিনটিকে কবি। পঞ্চভূত গ্রন্থে পুণ্যাহের অভিনব ব্যাখ্যা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। পুণ্যাহে যে বংশীধ্বনি হয়, সে প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, 'খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিনীর কোনো যোগ নেই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার কোনো স্থান নহে, কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানে বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমার পুণ্যদিন, আজ আমাদের রাজা-প্রজার মিলন, জমিদারি কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।'

পরবর্তীকালে ১লা বৈশাখ অন্য আর একভাবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাঁর জন্মদিনটি ২৫শে নয়, ১লা বৈশাখ পালনের সূচনা করেন তিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রেই এখন বাংলা নববর্ষ পালনের সমূহ জৌলুশ ও ঘনঘটা। এর সূচনা হয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান আমলে 'ছায়ানট'

বাংলা নববর্ষ: পুণ্যাহ থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রা

আমরা জানি যে, বাংলা নববর্ষকে আকবর নবরূপদান করেছিলেন খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে। এর দীর্ঘদিন বাদে ঔপনিবেশিক আমলে যখন জমিদার-কৃষক সম্পর্কটি প্রায় অহি-নকুলের হয়ে দাঁড়াল, তখন নববর্ষ পেল একটি গালভরা নাম– পুণ্যাহ। প্রজারা বাংলা বছরের প্রথম দিনে খাজনা দিয়ে যাবে জমিদারকে। সেদিন হয়তো জমিদারগৃহে আহারেরও বন্দোবস্ত থাকত। বৃষ্টি খরা দুর্ভিক্ষ যা-ই হোক না কেন, খাজনায় কোন মাফ নেই, যেমন জমিদারকেও কড়ায় গড়ায় সরকারকে দেয় প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হত নির্মম 'ঝঁহংবঃ খধি' বা সূর্যাস্ত আইন মোতাবেক। নইলে রাতারাতি জমিদার লাটে উঠত। কত জমিদার যে এই আইনের অভিশাপে পড়ে জমিদারি হারিয়েছেন। এই হল মূলত 'পুণ্যাহ' দিবসের মাহাত্ম্য। পরাধীন দেশে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করা যায় না।

তবু এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাহকে প্রজাদের পক্ষে প্রকৃত আনন্দময় করে তুলেছিলেন প্রজাদের সঙ্গে একাসনে

প্রতিষ্ঠানটির হাত ধরে, শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদুল হক এবং সন্‌জিদা খাতুনের উদ্যোগে, রমনার বটমূলে। আজ তা বহু শাখায় তরঙ্গিত হয়ে বাংলাদেশময় ব্যাপ্ত। হালে নববর্ষের দিনটিতে যে পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ যুক্ত হয়েছে, তা কিন্তু গোড়ায় ছিল না। মধ্য-আশি থেকে এর সূচনা, তবে নাচ-গান-আবৃত্তির প্রবাহে বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তাকে উদ্বোধিত করার সঙ্কল্প নিয়েই রমনার বটমূলে নববর্ষ পালন, এখন যা এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালির নবচেতনার প্রতীক এখন তা।

এর সঙ্গে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে যোগ হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে। একেবারেই দেশজ পদ্ধতিতে কাঠ, সোলা ও মাটির মাধ্যমে তৈরি পাখি, বাঘ, হাতি, ঘোড়া, টেপা পুতুল, পালকি, নৌকো, গরুর গাড়ি, পাখা, ঝালর ইত্যাদি বানিয়ে প্রদর্শনী বেরোয়। ব্যাপ্ত বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি জেলায় জেলায় চর্চিত ও প্রশ্রয়প্রাপ্ত, তারই প্রতিনিধিত্ব করে এই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। নয়ের দশকে এই শোভাযাত্রার সূচনা মূলত শিল্পী ইমদাদ হোসেনের পরিকল্পনামাফিক।

এখন কেবল ঢাকাতেই নয়, এর প্রসার ছাড়িয়ে পড়েছে ত্রিশালে নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর চারুকলা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সমগ্র বাংলাদেশে। মুখোশ, সরার ছবি, ফেস্টুন নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বেরোয়। এর নান্দনিকতা ও ঐতিহ্য একে রাষ্ট্রসংঘের হেরিটেজের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশ বাংলা নববর্ষকে প্রসারিত করে দিয়েছে সেখানকার আদিবাসী সমাজের মধ্যে যেমন, তেমনি সারা বিশ্বে। তাই লন্ডন শহরের বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা ব্রিকলেন-এ পয়লা বৈশাখে আনন্দের জোয়ার নামে। সেখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে হয় সাহিত্য উৎসব 'বুকলিট'। হাজার হাজার বাংলাদেশীতে ভরে যায় মাঠ। জার্মানিতেও অনুরূপ চিত্র। প্যারিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বাংলা নববর্ষ পালন এক অহংকার।

নববর্ষ: ভারতের নানা রাজ্যে

ভারতের অন্যত্র নববর্ষ পালিত হয় কীভাবে? দেখা যাক এবার। আদিবাসী জনজীবনে ঋতু, মাস, নববর্ষের ভূমিকা অপরিসীম। প্রসঙ্গত সাঁওতাল সমাজের কথাবলা যায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নববর্ষের সঙ্গে তাদের সমাজজীবন যে ওতপ্রোত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পরম্পরাক্রমে নতুন বছরের দিনটিতেই তাদের পুরনো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায় আর নতুন পঞ্চায়েত গঠনের দিন। প্রসঙ্গত, সাঁওতালদের নববর্ষ কিন্তু বৈশাখে নয়, মাঘমাসে। সাঁওতালিদের কাছে মাঘ মাসটি 'রাবাং' নামে পরিচিত। এইদিন একেক গ্রামের মানুষ প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব গ্রামে পূজাস্থান অর্থাৎ 'জীহের'-এ উপস্থিত হন। অনুষ্ঠিত হয় মাঘসীম বা মাঘকুনামী পরব। সারা বছর যাতে গ্রামে সুখশান্তি বজায় থাকে, এই প্রার্থনা করে মারাং বুরু ও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করা হয়। বলি দেওয়া হয় মুরগি।

গ্রামের বাইরে শস্যখেতে ঐদিন সাঁওতালদের আরেক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পূজিত হন 'সাকেত বোঙ্গা' অর্থাৎ সুখ-সমৃদ্ধির দেবতা। এখানেও মুরগিবলি প্রসিদ্ধ। আর যে-কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে অন্যান্য আদিবাসী সমাজে যেমন, সাঁওতালদের মধ্যেও তেমনি নাচগানের প্রথা রয়েছে। এর সঙ্গে আরও একটি লোকাচারও পালন করেন সাঁওতালরা। গোরু, মোষ, বলদ, ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের শরীরে নানান চিহ্ন এঁকে দেন এঁরা। নববর্ষ তাই সাঁওতালদের কাছে মানুষ ও পশু নির্বিশেষে উদ্‌যাপিত হওয়ার শুভদিন। আর এ মাসেই যে গ্রামপ্রধান নির্বাচনের প্রথা, তার মধ্যে হয়তো নিহিত আছে শীত তার প্রকৃতিজ জাড়ের প্রভাবে পুরনোকে বিদায় জানায়, আনে আসন্ন বসন্তে নবীনকে আহ্বান করে। বসন্তে সাঁওতালদের বাহা পর্ব, সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

ভারতের মত বিশাল দেশে অজস্র ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্র ও আশ্চর্য রঙ্গভূমি। তাই প্রদেশে-প্রদেশে নববর্ষের ভিন্ন সুর, ভিন্নতর মাত্রা। পঞ্জাবে দিনটি যেমন 'বৈশাখী' হিসেবে পালিত হয়, তেমনি মারাঠিদের নববর্ষ চৈত্রের গোড়াতে গোড়াতে হয়, যা 'গুড়ি পওয়া' নামে খ্যাত। মারাঠিদের বিশ্বাস, নববর্ষের পুণ্যদিনেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন। পঞ্জাবের যে 'বৈশাখী', তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শিখ-ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত জানার অবকাশ রয়েছে।

মধ্যযুগের ভক্ত সাধক ও শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে যে ধর্মমত গড়ে তোলেন, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে নানা শিখগুরুর আবির্ভাব হতে থাকে। গুরু অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকিষণ, তেগবাহাদুর ও গোবিন্দ সিং– শিখদের এই দশজন গুরু। ভারতে তখন মোগল রাজত্ব। চতুর্থ গুরু রামদাসের ধর্মবিষয়ে গভীরতা ও কৃচ্ছ্রতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর তাঁকে অমৃতসরে যে জমি দান করেছিলেন, সেখানেই নির্মিত হয় শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র অমৃতসর। পরবর্তী সম্রাটরা কিন্তু শিখদের সঙ্গে এই সৌহার্দ বজায় রাখেননি। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হন, কারণ অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করেছিলেন। গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখদের নিয়ে সামরিক বাহিনি গড়ে তুলেছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে তিনি পাঠানদের স্বদলে আনার চেষ্টা করলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং তিনি প্রথমে বন্দী হন ও পরে সপ্তম শিখগুরু হররায় শাজাহানের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নে শাহজাদা দারাকে সমর্থন করায় ঔরঙ্গজেব তাঁর শিরশ্ছেদ করেন। পরবর্তী অর্থাৎ নবম গুরু তেগবাহাদুরও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে যখন ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করেছিলেন, তখন ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেন। স্বভাবতই তেগবাহাদুরের কাছে তা মর্যাদাহানিকর বিবেচিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁরও শিরশ্ছেদ করেন।

তিন তিনজন শিখগুরুর হত্যা পরবর্তী অর্থাৎ দশম বা শেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি শিখজাতিকে একটি প্রবল প্রতিস্পর্ধীবাদী যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করার শপথ নেন। পিতা তেগবাহাদুরের হত্যা তাই শিখ সামরিক ইতিহাসে নবযুগ আনে। গোবিন্দ সিং শিখদের নিয়ে 'খালসা' বাহিনি গঠন করেন। আদেশ দেন প্রতিটি শিখকে অস্ত্রধারণ করবার। তাছাড়া শিখদের জন্য তিনি পাঁচটি 'ক'- এরও প্রবর্তন করেন। সেগুলো হল– কেশ (লম্বা চুল), কঙ্কতী (চিরুনি), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (খাটো পাজামা) আর কড় (লোহার বালা)। ১৬৯৯ ইংরেজি সালের ১লা বৈশাখ অর্থাৎ নববর্ষের দিনটিতেই 'বৈশাখী' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে খালসা বা 'Brotherhood of Saint Soldiers' গঠিত হয়। তাই শিখদের কাছে 'বৈশাখী' তথা নববর্ষের দিনটি অনন্য মাত্রা নিয়ে আসে।

দক্ষিণ ভারতে শকাব্দের প্রথম দিনটিকেই নববর্ষ হিসেবে পালনের রীতি আছে। 'যুগাডি' বলা হয় দিনটিকে। অন্ধ্র, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রেও পয়লা চৈত্র দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। সাতবাহন বংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী এই শকাব্দের প্রবর্তক। এখন যে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার পৃথিবীময় মান্যতা পেয়েছে, তার সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের পার্থক্য ৭৮ বছরের। সেই হিসেবে ২০১৮ সাল হল ১৯৪০ শকাব্দ। দক্ষিণ ভারতে বিন্ধ্য এবং কাবেরি নদীতীরস্থ তিনটি রাজ্যে এই নববর্ষ পালিত হয়। এছাড়া রাজস্থান ও সিন্ধু প্রদেশের মানুষও এদিনটিকে নববর্ষের মর্যাদা দিয়েছে। রাজস্থানীদের কাছে দিনটি 'থাপনা' নামে খ্যাত এবং সিন্ধিদের কাছে 'চেতি চাঁদ'। তামিলনাড়ুতে দিনটি হল 'পুথাণ্ডু'। এমনকি মণিপুরেও শকাব্দের প্রভাবে এই দিনটিকে নববর্ষ ধরা হয়ে থাকে। তাঁদের ভাষায় নববর্ষ হল 'সাজিবু সংগমা পানবা'। প্রসঙ্গত, 'উগাডি' শব্দটি অন্ধ্র প্রদেশে ব্যবহৃত হয়, আর কর্নাটকে এর আলাদা অভিধা রয়েছে– 'বেভু বেল্লা'। ঐদিন অন্ধ্র ও কর্ণাটকে ঘরকে আমপাতার মালা দিয়ে সজ্জিত করার রেওয়াজ। সিদ্ধিদাতা গণেশ আম্রপল্লবপ্রিয় (আম পাতা নয় কেবল, এই পুণ্য দিনটিতে তালমিছরি, কাঁচা আম, তেঁতুল, নিমফুল, লবণ আর কাঁচা লঙ্কার সমাহার ঘটানো হয়, যার বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদ শৈশব থেকে বার্ধক্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত– আম্রপত্র 'থোরানা' বড় পবিত্র দক্ষিণীদের কাছে, এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীমাত্রেরই কাছে। যে-কোন উৎসবে আম্রপল্লব ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তাই। এমনকি বৌদ্ধদের কাছেও এই ফলটি পবিত্র, সম্ভবত বুদ্ধদেবের জন্ম বৈশাখে বলেই। তাঁর আবির্ভাবের দিনটিতে ভক্তরা তাঁকে আম্রফল নিবেদন করে থাকেন। জাতকের একটি কাহিনির নাম হল 'আম্রজাতক'।

কিংবদন্তী অনুসারে 'যুগাদি' বা যুগ আদি চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াণ ও সেই সঙ্গে দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে কলিযুগের আবির্ভাবে। ইতিহাস, মিথ ও যুগ যুগ ধরে চলে আসা লোকাচারের পরম্পরাগত ঐতিহ্য বহন করে টিকে আছে বিভিন্ন স্থানিক নববর্ষের উদ্‌যাপিত ক্রিয়াকলাপ।

তামিলনাড়ুতে যে নববর্ষ পালিত হয়, তা কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের 'উগাদি' পালনের মত চৈত্রমাসে হয় না। হয় বৈশাখ মাসে। 'পুথাণ্ডু' নামে এই নববর্ষ তামিলনাড়ু ছাড়া শ্রীলঙ্কাতেও তামিলভাষীদের মধ্যে পালিত হয়। মালয়ালমভাষী কেরালাও বৈশাখে তাদের নববর্ষ পালন করে, যার নাম 'বিষু'। অর্থ, সমান। কীসের সমান? এসময় সূর্য নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করে বলে দিন ও রাত্রির পরিমাপ সমান থাকে। কেরালায় দিনটি উদ্‌যাপিত হয় কেরলবাসীর নিজস্ব প্রথায়। 'কানি কানাল' নামে এই লোকাচারটি পালিত হয় বাড়িতে এবং মন্দিরে। কথাটির অর্থ হল, 'প্রথম দর্শন'। এইদিনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই শুভ কিছু বস্তু দেখলে সারা বছর সুখ-সমৃদ্ধিতে কাটবে বলে কেরলবাসীদের বিশ্বাস। কী কী জিনিস? শাদা কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, গন্ধপুষ্প, বই, নারকেল ও কুমড়ো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ঘুম ভাঙিয়ে চোখ বোজা অবস্থায় এসবে সজ্জিত

থালার সামনে নিয়ে আসা হয় এই মাঙ্গলিক বস্তুনিচয় দেখানোর জন্য। কেরলে ঐদিন শিশুকিশোরদের হাতে কিছু পয়সাকড়ি দেবার রীতি আছে। প্রথাটির নাম 'বিষু কাইনিকম।' আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালিদের মধ্যেও কিন্তু প্রথাটি আছে, যাকে বলে, 'খৌল খরচ।' খৌল' বা 'খোল' কথাটির অর্থ 'অল্প', কিয়ৎ পরিমাণ। ছোটদের দেওয়া হবে, তা কি খুব বেশি পরিমাণে দেওয়া কাম্য? তাছাড়া তাদের খরচের অবকাশও তো অল্পই হয়ে থাকে। সেজন্যই খৌল খরচ।

নববর্ষে প্রায় সবাই নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়, ভারতের প্রায় সব রাজ্যে। আর এ-উপলক্ষে মেলাও অনুষ্ঠিত হয়, বসে গান-বাজনার আসর, নৃত্যানুষ্ঠান। বাজিও পোড়ানো হয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে।

মহারাষ্ট্রে যে নববর্ষ ঐতিহ্যিকভাবে পালিত হয় অন্ধ্র ও কর্ণাটকের 'যুগাদি'র দিনেই, সে অনুষ্ঠানের অপর একটি নাম রয়েছে– গুড়ি পাদোয়া (Gudi Padwa)। মারাঠী বিশ্বাস, ব্রহ্মা এই দিনটিতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে ঐদিন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন বলেও বিশ্বাস অনেকের। সে যাই হোক, একই দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু আর কেরালায় নববর্ষ পালিত হচ্ছে বৈশাখে আবার অন্ধ্র আর মহারাষ্ট্রে চৈত্র মাসে, এটা বেশ অদ্ভুত লাগে। অন্ধ্র-সংলগ্ন ওড়িশায় যে নববর্ষ তার নাম 'মহাবিষুব সংক্রান্তি।' এটিও অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। এ দিনটিকে 'পান সংক্রান্তি'ও বলে, কারণ বহুবিধ ফলের রস ও দই খেয়ে উদ্‌যাপিত হয় দিনটি। হনুমান পুজো করেন ওড়িশাবাসী ঐদিনে, সমুদ্র-বেষ্টিত রাজ্যটি যাতে ঝড়জল থেকে রক্ষা পায়।

একদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ বা বর্মা (বর্তমান মায়ানমার), আনাম (বর্তমান ভিয়েতনাম), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচিত হওয়ার ফলে এসব দেশে বহুবিধ ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ব্যাপক অনুসরণ ঘটে।'জাতক', 'কথাসরিৎসাগর' এবং আরও বহু গ্রন্থে এসব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের খবর পাওয়া যায়। এসব দেশের কোথাও কোথাও ভারতের রাজনৈতিক প্রভুত্বও স্থাপিত হয়েছিল, যার স্থায়িত্বকাল ছিল হাজার বছরেরও বেশি। কম্বোজ বা কম্বোডিয়া ছিল, এরকম একটি দেশ, যার রাজধানী যশোধরপুর সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'It was one of the grandest cities in the whole world in that age.'(An Advanced History of India)। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে হাজার বছরেরও বেশি এদেশে ভারতীয়রা রাজত্ব করেছে, গড়েছে আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দিরসহ আরও বহু স্থাপত্য। তেমনি ভিয়েতনামের একটি অংশ নিয়ে যে চম্পা রাজ্য গড়ে ওঠে, সেখানে শ্রীমার নামে জনৈক ভারতীয় রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা। মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যও ভারতীয়দের দ্বারা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন বাঙালি, নাম কুমার ঘোষ। সে-দেশের রাজা বালপুত্রদেব পালরাজ দেবপালের অনুমতিক্রমে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য রূপে চিহ্নিত বরোবুদুর স্তূপ এখানেই অবস্থিত।

নববর্ষ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এইসব দেশ নিয়ে আলোচনার হেতু হল, এ-সব দেশে আজও কিন্তু ঐতিহ্য মেনে ভারতীয়মতেই নববর্ষ পালিত হয়ে থাকে। বর্মা, কম্বোডিয়া, লাওস এবং অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর দেশে দিনটি 'সংক্রান'রূপে পালিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যেও দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। মায়ানমারে দিবসটি Thingyan নামে পরিচিতি, যার অর্থ জলক্রীড়া। এই দিনটিতে ওখানে জলখেলা প্রশস্ত তো বটেই, কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে হাতি শুঁড়ে করে জল ছেটায়, এবং সে-জল দিয়ে নিজেকে সিঞ্চিত করে তোলা সাংবাৎসরিক সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাই দেখা যাচ্ছে, নববর্ষের সূত্র ধরে বৃহত্তর ভারতের ঐতিহ্য এখনও ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে।

যেমন আরও এক সমান্তরাল ধারা নওরোজের। ২০ বা ২১শে মার্চ দিনটি ইরানে পালিত হত। ইরান আবার এটি নিয়েছিল সুমেরীয় সভ্যতা থেকে। ভারতে মুঘল আমলে বাদশাহরা একে রাজকীয় মর্যাদা দিলেন। এখনও আফগানিস্তান, পাকিস্তানের কোনও কোনও অঞ্চল, মধ্য এশিয়ায় এই পর্বটি অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে পালন করা হয়। পারস্য বা ইরানে এ-উৎসবটি তিন হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন। ২০১০-এ রাষ্ট্রসংঘ উৎসবটিকে ঐতিহ্যিক স্বীকৃতি জানায়। নববর্ষ আর বসন্তোৎসবের দ্বৈত মাধুর্যে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। ইরানীয়রা ঐদিন তাঁদের পূর্ব পুরুষদের আত্মাকে অভ্যর্থনা জানান। এজন্য ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করে তোলা বিধি। নতুন জামা-কাপড় পরে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবসহ আহারে বসেন তাঁরা। খাবার টেবিলের সরঞ্জাম সাজানো হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, যাকে বলে 'হ্যাফ্‌ট সিন'। জেন্দ আবেস্তার ভাষায় 'নওরোজ' কথাটির অর্থ 'নতুন দিন' বা 'দিনের আলো।' প্রাচীন ইরানীয়দের বিশ্বাস ছিল, এইদিন তাঁদের ঈশ্বর আহুর মাজদা পৃথিবীতে নেমে আসবেন মানুষের মধ্যে নিচতা, ক্ষুদ্রতা দূর করে দিয়ে তার মধ্যে চিরন্তন শুভবোধ জাগাতে। পৃথিবীতে কুৎসিত বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না বুভুক্ষা অসুন্দর, আর কেউ-ই অসুখীও থাকবে না। এই অত্যাশ্চর্য সংঘটনকে প্রাচীন ইরানীয়রা 'রাস্তাখিজ' নামে অভিহিত করেন, যাকে পুনর্জাগরণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। বলা হয়, ইরানীয় শাসক জামশেদ এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। আহুর মাজদার নামে এদিন মদ্যপানেরও আয়োজন থাকে। কিংবদন্তী যে, স্বয়ং জামশেদ ছিলেন মদ্য প্রস্তুতির দক্ষ একজন কারিগর।

ইরান ও ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে আর্যদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনকারী দুটি দেশ। অতএব আর্যদের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তার সমান্তরালতা দু'দেশেই দেখা যায়। কিন্তু নববর্ষের প্রশ্নে অর্থাৎ ঋতুগত প্রশ্নে ভারতীয় আর্যরা কিন্তু শরৎকেই বেশি পরিমাণে মর্যাদা দিয়েছেন। 'কুর্বেন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেস্থতং সমাঃ' অর্থাৎ কাজ করতে করতে শত শরৎ বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা করবে, বা 'জীবেম শরদঃ শতম্' (যেন শত শরতের আয়ু লাভ করি), উপনিষদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে শরৎকালের প্রতি ভারতীয় আর্যদের সম্ভ্রান্ত মনোভাব লক্ষ করা যায়।

ভারতবর্ষের পাশের দেশ তিব্বত। এদেশের নববর্ষ পালন 'লোসার' নামে পরিচিত। তিনদিন ধরে তিব্বতীরা নববর্ষ উৎসবে মেতে থাকেন। সেখানকার পোতালা প্রাসাদের মন্দিরের দেবীকে উৎসর্গ করা হয় বিশেষ এক ধরনের পিঠে যার নাম 'তোরমা।' যখন দালাই লামা থাকতেন, সে-সময় এইদিনে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা জানাতেন। দীর্ঘদিন ধরে দালাই লামা ভারতে নির্বাসিত। তবে এই লোসার কেবল তিব্বতেই নয়, ভারতের বহু বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। লাদাখ ও অন্যত্র দেখা যায় এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সমাধিস্থলে প্রদীপ জ্বালানোর মত প্রয়াতদের স্মরণ ও অর্চনা লোসারের আবশ্যকীয় অঙ্গ। অল্পবয়সীরা মুখোশ পরে আনন্দ করে আর তাদের পোশাক রঞ্জিত হয় পশুর অবয়বে। এই উৎসব দু'সপ্তাহ ধরে প্রলম্বিত হতেও দেখা যায় কোথাও কোথাও। ভুটান আর নেপালেও এই 'লোসার' (লো= বছর, আর সার = নতুন) এক অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। নেপালে এছাড়া 'বৈশাখী'ও উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমটি পালন করে বৌদ্ধরা, আর দ্বিতীয়টি সেখানকার হিন্দুরা। নেপালে আবার এর অন্যতর বৈচিত্র্য রয়েছে। গুরুং সম্প্রদায় পালন করে থাকেন 'টোলো লোসার', 'সোনাম লোসার' টামাং জনগোষ্ঠীর, আর 'গিয়ালপো লোসার' হল শেরপা ও ভুটানিদের যাপিত উৎসব। প্রথমটি ডিসেম্বরে, দ্বিতীয়টি ফেব্রুয়ারি ও তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মার্চে। তাই নেপালের 'লোসার' উৎসবকে পুরোপুরি নববর্ষ উৎসব বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

তিব্বতের 'লোসার' উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল, এ সময় বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বৌদ্ধধর্মের নানা বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে, সুদূর অতীতে এরকমই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন হয়তো বাঙালি পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা তাঁরও পূর্বে তিব্বতে যে-দু'জন বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত গিয়েছিলেন, সেই শান্তরক্ষিত ও কমলশীল!

ভারতবর্ষে এবং তার প্রতিবেশী দেশসমূহে যে নববর্ষের আলোচনা এতক্ষণ করা গেল, সেখানে শ্রীলঙ্কা নিয়ে আলোকপাতও জরুরি। আমরা জেনেছি যে, চেন্নাইয়ে যে নববর্ষ পালিত হয়, যা 'পুথাণ্ডু' নামে পরিচিত, তা তামিলভাষী শ্রীলঙ্কাবাসীরাও পালন করে থাকেন। সেখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় বৌদ্ধ পঞ্জিকানির্ভর 'বাক' মাসে নববর্ষ পালন করেন। 'নোনাগাথে' অর্থাৎ পুরনো ও নতুন বছরের মধ্যবর্তী একটি নিরপেক্ষ সময়

কল্পিত হয়েছে, একমাত্র দেব-আরাধনা ছাড়া সবকিছুই তখন নিষিদ্ধ। আগে কোকিলের ডাক শুনে নববর্ষের শুভক্ষণটি ঠিক করা হত। কিন্তু এখন জ্যোতিষবচনই একমাত্র গ্রাহ্য। এইদিনটিকে বলা হয় 'অলুখ অউ রুডু'। সেদিন ভেরী বাজিয়ে আহ্বান করা হয় নতুন বছরকে। সেই 'রাবান' বা ভেরীর শব্দ নতুন বছরের নতুন দিনটিকে নবতর মাত্রা দেয়। অশোকের অনুশাসনে যে রয়েছে 'ভেরী ঘোসো অহো ধম্মো খোসো', এ যেন তারই চিরায়ত ও শাশ্বত অনুরণন।

নববর্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র সব প্রথা পালিত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। এশীয় ভূখণ্ডে তা এক রকম, ইউরোপে অন্য রকম। বালি ও জাভায় যেমন দিনটি নীরবতা পালনের দিন, আর পুজো-আচ্চা, উপোস ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হয় দিনটিকে। বিমানবন্দর বন্ধ থাকে বালিতে, রোগী বহন করা ছাড়া গাড়ি চলাচলও নিষেধ। অন্যদিকে ফরাসিরা এই দিনে (স্বভাবতই ১লা জানুয়ারি) বাড়িতে সঞ্চিত যাবতীয় মদ খেয়ে শেষ করে (বছরের শেষ দিনে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর। পুরনো মদ গৃহস্থের সৌভাগ্যনাশকারী, এই বিশ্বাস থেকেই এরকম করা

হয়)। অন্যদিকে গ্রিসদেশে নববর্ষ ১লা নয়, পালিত হয় ২রা জানুয়ারি, সেন্ট বেসিল (৩৩০-৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রতি শ্রদ্ধায়। পূর্ব ইউরোপে স্বয়ং যিশুর পরে এঁর মান্যতা সর্বাধিক, যাঁর নামে বিখ্যাত গির্জা রয়েছে মস্কোতে। খ্রিস্টধর্মে পরম বিশ্বাসী এই সন্ত বলেছিলেন, 'Beside each believer stands an Angel as protector and shepherd, leading him to life.' গ্রিসে এদিন একটি রুটি প্রস্তুত হয়, ভিতরে মুদ্রা থাকে। যার ভাগ্যে সেই মুদ্রা লাভ ঘটে, বছরভর সুখসমৃদ্ধিতে কাটবে তার, এরকমই বিশ্বাস মানুষের। বলাবাহুল্য, এগুলো সবই সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। যেমন স্পেনবাসীদের নববর্ষের পূর্ব রাতে বারোটি আঙুর খেয়ে নেওয়া রীতি। জার্মানরা একপাত্র জলের মধ্যে গলানো সিসা ঢেলে নিয়ে পরখ করে, সিসা কেমন আকার নেয়। তা দেখে তারা বছরের ভাল মন্দের সালতামামি করে।

দেশে দেশে এমন সব লোকাচার নববর্ষের সঙ্গে যুক্ত হলেও দিনটিকে আনন্দমুখর করে কাটানোর অভীপ্সা সব দেশেই দেখা যায়। কার্নিভাল, মেলা, নাচ-গান হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, নতুন পোশাক পরা, এই হল নববর্ষ পালনের সাধারণ রীতি। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ ঐতিহ্যে পালিত নববর্ষ পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১লা জানুয়ারির নববর্ষ পালন অনুষ্ঠান। সমগ্র বিশ্বের অনুমত যে গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী, তার ওপর ভিত্তি করেই মূলত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ চলে। তাই স্বভাবতই ১লা জানুয়ারির ভূমিকা সর্বাতিশায়ী হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ তথা এই উপমহাদেশ যেহেতু প্রায় দুশো বছর ইংরেজদের অধীনে ছিল, তাই ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয় যেমন অনুসৃত হয়ে গেছে, তেমনি বড়দিন, রোববারের ছুটি, ১লা জানুয়ারি নববর্ষ উদ্‌যাপনও উপমহাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। একদা ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতায় ইংরেজদের নববর্ষ পালনের ছবি ধরা পড়েছে হুতোম প্যাঁচার নকশায়, 'ইংরেজরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীতে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরন করে ন্যান– নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরানকে বিদায় দেন।' এরই পাশাপাশি ছাপোষা বাঙালির করুণ নববর্ষ-উৎসব পালনের ছবিও রয়েছে, 'বাঙালীরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাপেই শেষ হোক, সজনেখাঁড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্যি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরানকে বিদায় দেন। কেবল কলসি উচ্ছগ্‌গুকর্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাতেও ইংরেজের নববর্ষের বাঙ্ময় চিত্র। তিনি লিখছেন, 'নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।/ বিলাতীর শকে আসি করিলা আশ্রম ॥/ খৃস্টমতে নববর্ষ অতি মনোরম।/ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥' তিনি আরও লিখছেন, 'নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরেজটোলায়।/ দেখে আসিওরে মন আয় আয় আয় ॥/ শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।/ কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥' তবে কী নববর্ষ, কী বৈশাখের আগমনী, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাঙালি তার পরম অনভূতির মন্ত্রস্পর্শ লাভ করে। তাই তাঁর কথা দিয়েই আমরা বর্তমান নিবন্ধ শেষ করব। 'যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,/অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।'

● **মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়** ভারতের কবি, কথাসাহিত্যিক

ফিস টোম্যাটো স্টাফড

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ

জাফরান চিকেন

স্পাইসি ক্যাবেজ রাইস

রসনায় বৈশাখ

পুরনোকে বিদায় জানিয়ে হৈ হৈ করে এসে পড়ল বাংলা নববর্ষ ১৪২৯। সঙ্গে নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং অবশ্যই বাঙালির চিরদিনের, চিরপ্রিয়– মাছ-মিষ্টি-চিকেন। তিন অভিবাসী বাঙালি বৈশাখের রসনাতৃপ্তির খবর দিয়েছেন

ফিস টোম্যাটো স্টাফড

উপকরণ

- টোম্যাটো (৪টে বড় সাইজের)
- রুই অথবা কাতলা মাছের পেটি (৪টে কাঁটা ছাড়ানো)
- ১টা পেঁয়াজ (কুচনো)
- আদা বাটা (এক টেবল-চামচ)
- রসুন বাটা (এক টেবল-চামচ)
- ২টি কাঁচালঙ্কা কুচনো
- ধনেপাতা কুচনো (২ টেবল-চামচ)
- গরমমশলা গুঁড়ো (আধ চা-চামচ)
- গোলমরিচ গুঁড়ো (এক চা-চামচ)
- সর্ষে অথবা সাদা তেল (আধ কাপ)
- নুন স্বাদ মত

গ্রেভির উপকরণ

- পেঁয়াজ বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- রসুন বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- আদা বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- হলুদ গুঁড়ো (আধ চা-চামচ)
- চিনি (আধ চা-চামচ)
- নুন স্বাদ মত

প্রণালী

- প্যানে অথবা কড়াইতে তেল গরম হলে মাছগুলো হাল্কা করে ভেজে নিতে হবে। মাছের কাঁটা এবং ছাল ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- টোম্যাটোগুলোর মাথা গোল গোল করে কেটে নিতে হবে। মাথাগুলো ফেলবেন না। টোম্যাটোগুলোর ভেতর পরিষ্কার করে দানা বের করে নিতে হবে।
- আর একটা প্যানে অথবা কড়াইতে মাছ ভাজার কিছুটা তেলেই কুচনো পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। ভাল করে ভাজা হলে তাতে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। এবার বাকি মশলাগুলোও একে একে দিয়ে ভাল করে কষতে থাকুন।
- মাছগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। একটু মিশে গেলেই মাছের পুর তৈরি।
- টোম্যাটোগুলোর ভিতরে অল্প নুন বুলিয়ে নিতে হবে। চামচ করে আস্তে আস্তে টোম্যাটোগুলোর মধ্যে পুর ভরতে হবে। পুর ভরা হয়ে গেলে টোম্যাটোর মাথাটা আলতো করে লাগিয়ে দিয়ে উপর থেকে একটা টুথপিক লাগিয়ে দিতে হবে যাতে খুলে না যায়।
- কড়াই অথবা প্যানে বাকি মাছ ভাজার তেলটা দিয়ে দিন। তেলটা গরম হলে তাতে পেঁয়াজ এবং আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে থাকুন। তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে একে একে হলুদ গুঁড়ো, নুন এবং চিনি দিতে হবে। টোম্যাটোর ভিতরের রসটা দিয়ে দিন। আঁচটা কমিয়ে দিন।
- ফুটে উঠলে একটা একটা করে পুরভরা টোম্যাটোগুলো দিয়ে দিন। কড়াই অথবা প্যান ঢাকা দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট রেখে টোম্যাটোগুলো উল্টে দিন।
- দু'মিনিট পর টোম্যাটোগুলোর খোসা অল্প কুঁচকে গেলে এবং গ্রেভিটি ঘন হয়ে গেলে বুঝবেন আপনার ফিস টোম্যাটো স্টাফড তৈরি। কুচনো ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ফিস টোম্যাটো স্টাফড।

সঞ্চিতা মোহান্তি টরেন্টো (কানাডা)

জাফরান চিকেন

উপকরণ

চিকেন (হাড় শুদ্ধ বা বোনলেস) ১ কেজি

- পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ
- রসুন বাটা ১ টেবল-চামচ
- আদা বাটা ১ টেবল-চামচ
- গোটা গরমমশলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা)
- গোটা জিরে ১ চিমটি
- জাফরান ১ চিমটি
- দুধ ১/২ কাপ
- কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টে

- টোম্যাটো বাটা ২ বড় চামচ
- নুন স্বাদ মত
- চিনি সামান্য
- গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা-চামচ, ঘি সামান্য
- ধনে পাতা কুচি করে কাটা

প্রণালী

১. দুধে জাফরান ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে।
২. রসুন, আদা, নুন, চিনি এবং অল্প কাঁচালঙ্কা মাখিয়ে চিকেনটি ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে অনন্ত ২-৩ ঘণ্টা।
৩. কড়াইতে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে এতে একটি কাঁচালঙ্কা ছেড়ে ভেজে নিতে হবে।
৪. পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। চিকেনের মিশ্রণটি দিয়ে ভাল করে ভাজতে দিয়ে হবে। আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে অল্প কিছু ক্ষণ।
৫. চিকেন সেদ্ধ হয়ে এলে টোম্যাটো বাটা দিতে কষে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নাড়িয়ে নিতে হবে।
৬. এ বার এতে দুধ এ মেশানো জাফরান দিয়ে নাড়িয়ে নিতে হবে।
৭. ঢাকা দিয়ে ৪-৫ মিনিট ফোটালেই তৈরি জাফরান চিকেন।
৮. উপর থেকে ধনে পাতা কুচি, ঘি ও জাফরান ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

স্পাইসি ক্যাবেজ রাইস

উপকরণ

বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম
- বাঁধাকপি (লম্বা করে কুচানো) ২ কাপ
- গোটা সর্ষে ১ চামচ
- গোটা জিরে ১ চামচ
- হিং ১ চিমটে
- রসুন কুচি ১ চামচ
- কারিপাতা ৪/৫ টি
- ধনে পাতা কুচি ২ চামচ
- লঙ্কা গুঁড়ো/কুচানো কাঁচা লংকা ২ চামচ
- হলুদ গুঁড়ো অর্ধেক চামচ
- ধনে গুঁড়ো ১ চামচ
- জিরে গুঁড়ো ১ চামচ
- পাতিলেবুর রস আন্দাজ মত
- নুন স্বাদমত
- কাঠ বাদাম ২ চামচ
- কড়াইশুঁটি ২ চামচ
- সাদা তেল ২৫ গ্রাম

প্রণালী

প্রথমে চালটা অল্প শক্ত রেখে ভাতটা করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে বাদামগুলো লাল লাল করে ভেজে রাখুন। এর পর কড়াইতে তিন চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে আঁচ কমিয়ে দিয়ে সর্ষে, জিরে ও হিং ফোড়ন দিন। ২ মিনিট পর কুচানো রসুনগুলো দিয়ে দিন।

অল্প লাল হয়ে এলে কারিপাতা দিয়ে দিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধা কপি দিয়ে সামান্য লবণ ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে-চেড়ে চাপা দিয়ে দিন।

১০ মিনিট মত হওয়ার পর ভাতটা দিয়ে দিন এবং তার উপর লঙ্কা, হলুদ ও লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

২ মিনিট পর আঁচ কমিয়ে ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো ও মটরশুটি মিশিয়ে চাপা দিন।

প্রায় ৫/৭ মিনিট পর চেখে দেখে লবন ও ঝাল দিতে পারেন। আঁচ বন্ধ করে দিয়ে কুচনো ধনে পাতা ও বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে কষা মাংসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সায়ন্তী ভট্টাচার্য সুইডেন

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ

উপকরণ

ছানার মিষ্টি বানানোর জন্য
- দুধ ১ লিটার
- ছানা অথবা পনির (১ লিটার দুধ থেকে বানানো)
- কন্ডেন্সড মিল্ক ২ কাপ
- ভ্যানিলা (১/২ চামচ)
- আলমন্ড
- পেস্তা
- স্ট্রবেরি

গাজরের পুর বানানোর জন্য
- গাজর কোরা (৫টা বড় গাজর)
- দুধ (২ কাপ ঘন)
- গুড় (আখের গুড় ২ কাপ)
- দেশি ঘি (৫ চামচ)
- এলাচ গুঁড়ো
- কাজুবাদাম গুঁড়ো

প্রণালী

ছানার মিষ্টি বানানোর জন্য

প্রথমে একটা বড় পাত্রে দুধ ফুটতে দিন। দুধ ফুটে ঘন হয়ে এলে তাতে ছানা অথবা পনির গুঁড়ো করে মেশান এবং নাড়তে থাকুন।

দুধ ফুটে ৩/৪ হয়ে এলে তাতে কন্ডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে নাড়তে থাকুন যত ক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত মিশ্রণটি ফুটে শুকনো মিষ্টির রূপে পরিণত হয়।

এবার এতে ১/২ চামচ ভ্যানিলা যোগ করে মিশিয়ে দিন। সব শেষে আলমন্ড ও পেস্তা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিন।

এবার একটি চৌকো আকৃতির প্লেটে শুকনো মিষ্টির এই মিশ্রণটি রেখে উপর থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে সমান করে দিন এবং ফ্রিজে ৪-৫ ঘণ্টা রেখে দিন।

গাজরের পুর বানানোর জন্য

একটা ননস্টিক ফ্রাইপ্যানে প্রথমে ঘি দিয়ে তার পর তাতে কোরা-গাজর দিয়ে ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। ২০-২৫ মিনিট পর গুড় যোগ করে পুনরায় নাড়তে থাকুন এবং দুধ যোগ করে কম আঁচে রান্না করুন। আরও ১৫ -২০ মিনিট পর মিশ্রণটি শুকনো এবং লালচে হয়ে এলে এলাচ গুঁড়ো এবং কাজুবাদাম গুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

একটি প্লেটে পুরটি ঢেলে উপর থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে সমান করে দিন এবং ফ্রিজে ৪-৫ ঘণ্টা রেখে দিন।

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ এর জন্য

এ বার ফ্রিজ থেকে প্লেটগুলো বার করে ছুরি দিয়ে চৌকো আকারের সমান টুকরো করুন। একটা স্ট্রবেরিকে সমানভাবে লম্বালম্বি করে দু'টুকরো করুন।

তারপর একটা টুথপিক এর মধ্যে প্রথমে এক টুকরো স্ট্রবেরি, এক টুকরো ছানার মিষ্টি, এক টুকরো গাজরের পুর, আর এক টুকরো ছানার মিষ্টি এবং শেষে বাকি আরও এক টুকরো স্ট্রবেরি যোগ করুন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ।

অমৃতা পাল কানাডা

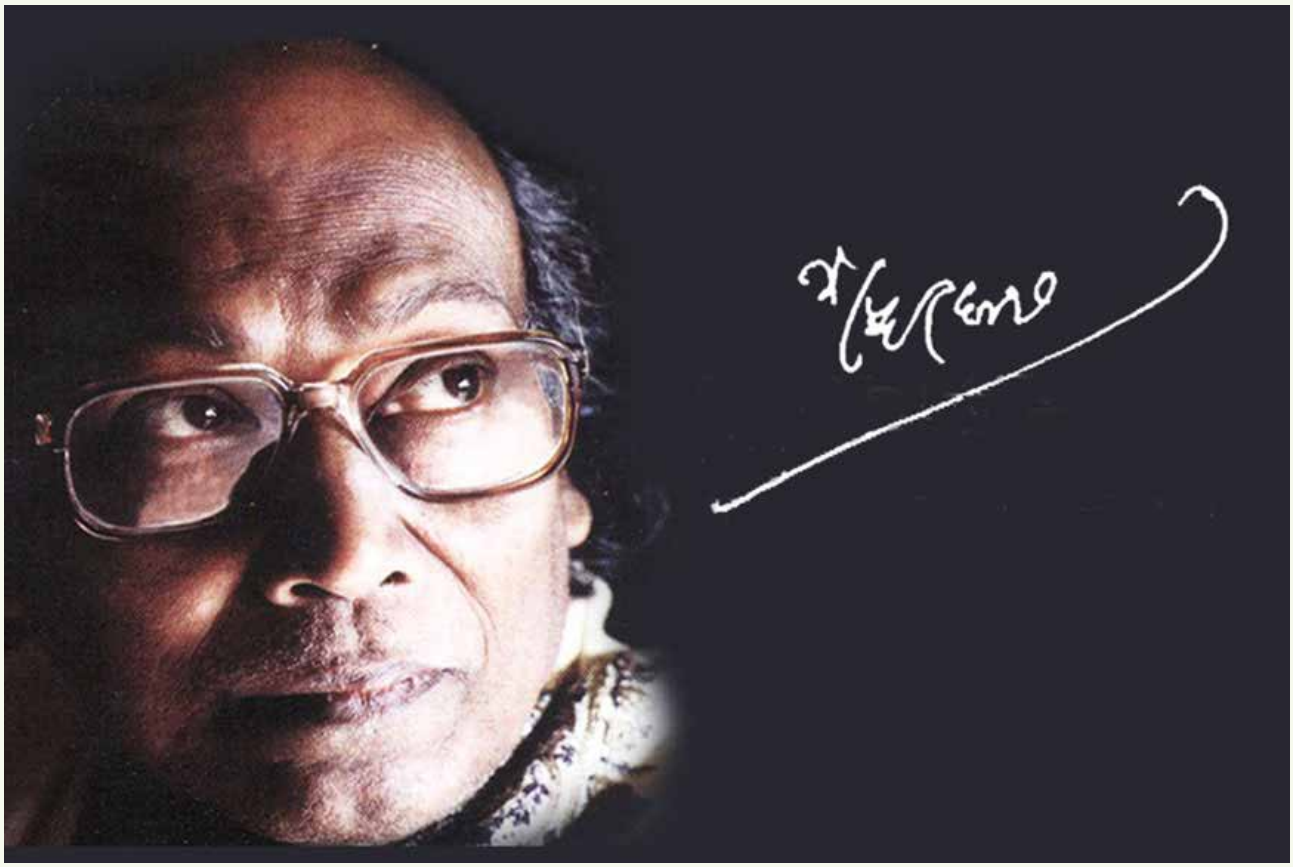

নিবন্ধ

শঙ্খ ঘোষের ‘কবির অভিপ্রায়’

এমিলি জামান

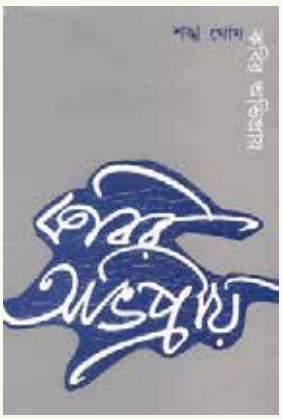

‘মারব নাকি নির্ভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কে মেরেছিল সেটাই-বা কে প্রমাণ করে।’

আবার– ‘পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ’।

এমন সব শাণিত ঝরঝরে পঙ্‌ক্তিমালার যিনি রচয়িতা, তিনি আর কেউ নন, তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই পাঠকের শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু শিক্ষাদান করেন, শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষকতার সঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষের সরাসরি সম্পৃক্ততাও ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যবিষয় নিয়েও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর দ্বারস্থ হতেন। কবি শঙ্খ ঘোষের পেশা ছিল অধ্যাপনা। কবিতা ও কর্মের শঙ্খ লাগাতার বাজাতে বাজাতে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন একাধারে কবিতা পিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী পাঠকগোষ্ঠীর শিক্ষাগুরু। তিনি শিখিয়েছেন যে, কীভাবে পড়তে হয় এবং পড়ে কী শিখতে হয়। শঙ্খর শিল্পিত পাঠদান কর্মে প্রভাষণ, বোর্ড ও মার্কারের স্থানাধিকার করেছে তাঁর গুটিকয় গদ্যনির্ভর সৃজন, যেগুলোর অন্যতম তাঁর ‘কবির অভিপ্রায়’ নামের একখানা গদ্যশাণিত পাতলা পুস্তিকা।

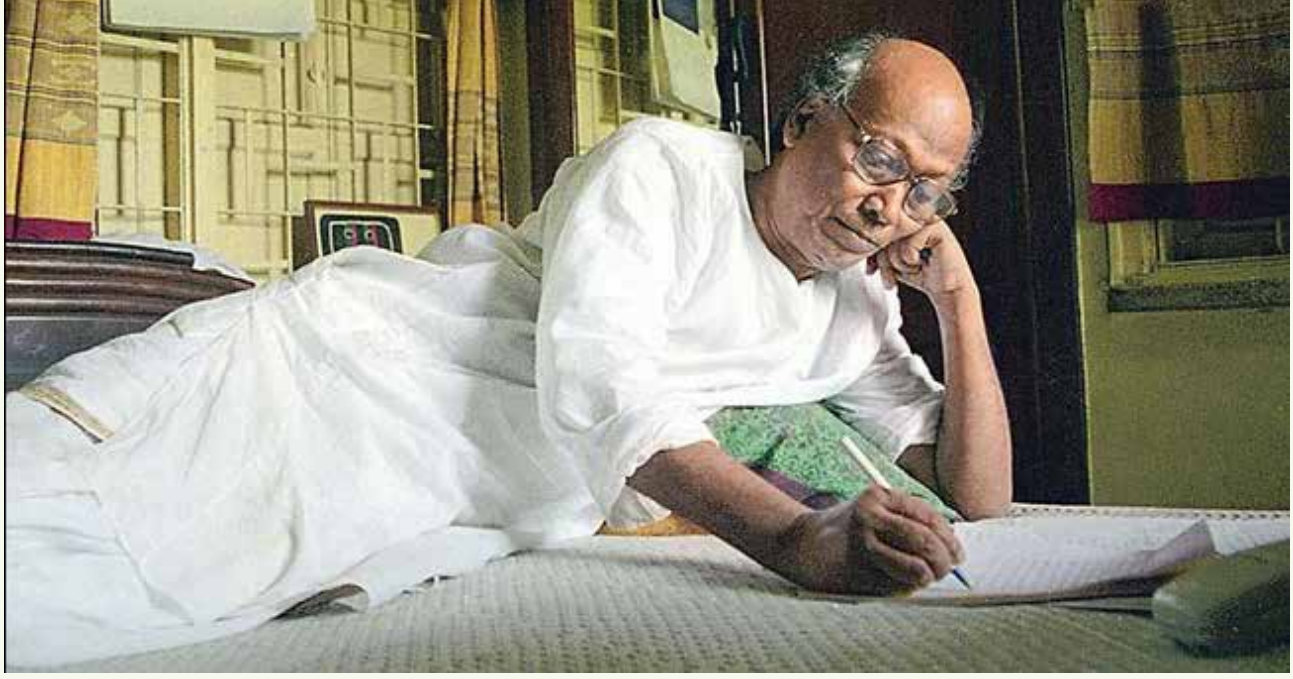

শঙ্খ ঘোষ কবি, কিন্তু তাঁর কাব্যখ্যাতি তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যার উপর দণ্ডায়মান না, তিনি মূল্যায়িত হয়েছেন তাঁর রসোত্তীর্ণ পঙ্‌ক্তিমালার নিরিখে। তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ১৫/১৬ টার বেশি না। প্রবন্ধ বইয়ের সংখ্যা ২৫। আরও অন্তত গোটাপাঁচেক গদ্য বই শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা। কবিতার চেয়ে গদ্য-রচনায় অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের গদ্য রচনা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি ও সাহিত্য-পরিব্রাজক শহীদ কাদরীর একগুচ্ছ আক্ষেপ ঝরানো বাক্য স্মরণাকাশে উঁকি দিল। কাদরী তাঁর 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি' নিবন্ধের একজায়গায় লিখেছেন– 'আমার একজন কবিতা-প্রবাসী বন্ধু পাছে গদ্য লিখতে হয় এই ভয়ে দেশে মা-বাবাকে চিঠিও লেখেন না। অথচ, যার একাধিপত্য সাহিত্যের ওপর এখনও টিকে রয়েছে, সেই মহামতি এলিয়ট চেয়েছিলেন কবিতাকে গদ্যের মত সুপাঠ্য, সর্বত্রগামী এবং ঋজু করে তুলতে।... কীভাবে যেন বাংলাদেশে দারুণ বোকা একটা কথা চালু হয়ে গেছে যে, কবিদের গল্প-উপন্যাস তো লিখতেই নেই, এমনকি কবিতার সমালোচনাও। ঐ বস্তু নাকি মৃতের শরীর থেকে কৃমি ও কীট খুঁটে তোলার মতই ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ আমি ভেবে পাই না, কবিরা ছাড়া কী করে অন্তত কবিতার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সেইসঙ্গে ভাল আলোচনা হতে পারে?... কবিরা গদ্য লিখবেন না, এটা কোনও কাজের কথা নয়। অথবা, গদ্য লিখলে কবিত্বের হানি ঘটবে– এমন অশিক্ষিত প্রচার কেবল তাকেই মানায়, যার কাব্যিক পুঁজিও অচিরাৎ ফুরিয়ে যাবে।' (তথ্যসূত্র: অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী। সম্পাদনা: সজল আহমেদ। প্রকাশনা কবি প্রকাশনী। কাঁটাবন, ঢাকা)

যাহোক, এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক 'কবির অভিপ্রায়' নামের পুস্তিকাটির দিকে। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে গবেষক ও সমালোচকবৃন্দ যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, এটা শঙ্খ ঘোষের ক্ষীণতনু পুস্তিকা 'কবির অভিপ্রায়'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বার্তা। আলোচ্য পুস্তিকায় আরও চিহ্নিত হয়েছেন বিরামহীন পাঠক রবীন্দ্রানুরাগী শঙ্খ ঘোষ। 'কবির অভিপ্রায়'-এর বার্তা এক নয়, একাধিক।

শিল্প-সাহিত্যের ভোজে যারা স্টার্টারে কোনওরকমে ঠোঁট ভিজিয়েই নিমন্ত্রণ রক্ষার ভদ্রতা সারেন, অর্থাৎ মেইন মিল আর ডেজার্টের স্বাদ গ্রহণ করার সময়টুকু যাদের হাতে থাকে না, তারা মাঝেমাঝে দু'চারটে আলটপ্‌কা সস্তা মন্তব্য করে বসেন। এসব মন্তব্যের একটা হচ্ছে 'গবেষক আর সমালোচকেরা কী এমন রাজকাজ করেন!' আলোচ্য পুস্তিকায় কবি শঙ্খ ঘোষ স্বয়ং গবেষক ও সমালোচকের ভূমিকায় নেমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এজাতীয় মন্তব্য খুব মূল্যবান নয়। শঙ্খ ঘোষের বক্তব্যের সামর্থনে 'বনলতা সেন'-এর কবি জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকার গুটিকয় বাক্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। জীবনানন্দ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় বলেছেন– 'পাঠক ও সমালোচকেরা কীভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং কীভাবে তা করা উচিত সেই সব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয় আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে।'

জীবনানন্দের প্রার্থিত সমালোচক যদি একজন কবি হন, তাহলে ঐ সমালোচক নিঃসন্দেহে পাঠকের শিক্ষাগুরু হয়ে উঠতে পারেন। যিনি আদর্শ শিক্ষাগুরু, তিনি 'হাততোলা' খাবার খাওয়ান না। তাঁর কাজ হচ্ছে– শিক্ষার্থীকে পিপাসিত করে তোলা, তারপর জলের কাছে নিয়ে যাওয়া; ঘোড়াকে দৌড় করিয়ে পিপাসা-কাতর করে তুলে জলাধারের সামনে নিয়ে আসতে পারলে ঐ ঘোড়া আপনা-আপনিই জল পান করে। জল খা, জল খা বলে চেঁচিয়ে তাকে জলপানের গুরুত্ব অনুধাবন করাতে হয় না। এই অর্থে পাঠকরূপ শিক্ষার্থীদের প্রতি আলোচ্য পুস্তিকায় প্রকৃত শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব পালন করেছেন সব্যসাচী সাহিত্যশিল্পী শঙ্খ ঘোষ। এটা তিনি কীভাবে করেছেন, তা জানতে আসুন, 'কবির অভিপ্রায়'-এর অন্দরমহলে প্রবেশ করা যাক। 'আলো লেগে যাওয়ার' শুভ ও আনন্দবার্তা দিয়েই শুরু করা যাক। 'কবির অভিপ্রায়'-এ শঙ্খ বলেছেন– 'কবি যা লিখেছেন, পাঠক তা পড়েন কিংবা পড়েন না। কবি ও পাঠকের মধ্যবর্তী সমালোচকেরা তাহলে কী করেন? এর প্রথম উত্তর নিশ্চয় এই সমালোচকেরাও পড়েন, তবে সেইখানেই থেমে না থেকে সেই পড়াটাকে তাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁরা আমাদের জানান কীভাবে তাঁরা পড়েছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর, এই জানানোর সূত্রে লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করে দেন তাঁরা। যে-লেখকের লেখা (যেমন ধরা যাক কমলকুমার মজুমদার) কিংবা লেখকের যে-লেখা (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত'-এর 'প্রতিধ্বনি') সবার কাছে খুব স্বচ্ছ লাগে না, সমালোচকের পড়বার পথটা জেনে হয়তো তাতে খানিকটা আলো লেগে যায়।' শঙ্খ ঘোষের 'সবার কাছে' খুব স্বচ্ছ লাগে না কলমোক্তির অন্তর্নিবাসী বার্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে টেনে আনা যায় কবি বিনয় মজুমদারের অন্যতম গভীরতাঋদ্ধ কলমোক্তি– 'কারো কারো বিশেষভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে।' আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাবনা-চিন্তার পার্থক্যের বিষয়টা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এটা আবহমানকালের। বাঁশি অনেকেই বাজান। কিন্তু, কেন পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বংশিবাদন প্রশংসার আধিক্য দাবি করে অতি সূক্ষ্ম শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারী দু'চারজন সংগীত সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য শোনার আগে সাধারণ শ্রোতারা তা বুঝিয়ে বলতে পারেন না। 'আমি দারুণ শিল্পপ্রেমী' একথা বলে কেউ কেউ সমাজে সংস্কৃতিবান হিসেবে চিহ্নিত হলেও, সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত তারা সব জেনে বসে আছেন, এটা শতভাগ সত্যি না। যাহোক, 'কবির অভিপ্রায়'-এ পথ খুঁজে ফেরা পাঠককে আলোর প্রদীপ জ্বেলে পথ দেখিয়ে দিতে সমালোচক ও গবেষকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরোধ জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। আর, আলোটা যাতে ঠিক জায়গায় পড়ে সে বিষয়েও তাদেরকে সজাগ থাকতে বলেছেন। গবেষক ও সমালোচকদের সবাই-ই যে সবসময় ঠিক জায়গায় আলো ফেলতে পারেন না, দু'জন সুপণ্ডিত গবেষক ও

সমালোচকের বিশ্লেষণের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে সেটাও তুলে ধরেছেন শঙ্খ। তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নিয়ে একদা সাহিত্য-পরিব্রাজক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণ ছয় পৃষ্ঠার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ পাঠকসাধারণের দপ্তরে প্রেরণ করেছিলেন। অথচ, সদর স্ট্রিটের বারান্দার প্রসঙ্গ চারুচন্দ্রের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হয়নি। জীবনের তথ্যানুসন্ধান অপ্রয়োজনীয় বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। পক্ষান্তরে, ঐ কবিতা নিয়ে যখন প্রমথনাথ বিশী লিখলেন, তখন তিনি সূচনা করলেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সূর্যোদয় দেখার ঘটনা দিয়ে। বিশীর বিশ্লেষণে প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে আর চারুচন্দ্রের বিশ্লেষণ খট্‌খটে শিক্ষাবিদের ব্যবচ্ছেদ হয়ে উঠেছে। সমালোচক যদি দর্পভরে কবিকে ছাপিয়ে যেতে চান, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা এসে কবি বা লেখকের সঙ্গে পাঠকের মাঝে দেয়াল তুলে দেয়। দেয়ালে আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে আনমনা পাঠক ভুল রাস্তা ধরে লেখা ও লেখকের কাছে পৌঁছতে চান। কিন্তু, গবেষক ও সমালোচক যদি রচয়িতার প্রতি সুবিচার করেন, তাহলে তিনি তাঁর সুপরিকল্পিত ও নিরপেক্ষ লেখার মাধ্যমে একাধিক মানসম্পন্ন পাঠক নির্মাণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। 'কবির অভিপ্রায়'-এর মাধ্যমে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের এই সূক্ষ্ম উপলব্ধির অর্থময়তা তুলে ধরতে রবীন্দ্র ও শঙ্খানুরাগী কবি জয় গোস্বামীর শরণাপন্ন হচ্ছি। জয় বলেছেন– 'কে রঙ লাগান? কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কে আছে রঙ লাগাবার মালিক? আসলে রবীন্দ্রনাথ পড়ে যতটা– ততটা এই পরিবেশ থেকে, এই জল-হাওয়া থেকে তাঁকে পেয়েছি।... তবে মানতেই হবে কখনও কখনও তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে। সবটাই যে নিজের চেষ্টায়– তা নয়। কখনও অন্য কারো সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। ভাগ্য বলে– সেই ভাগ্য শঙ্খ ঘোষ। সেই ভাগ্য বুদ্ধদেব বসু। আইয়ুবও (আবু সয়ীদ আইয়ুব) ছিলেন নিশ্চয়।'

জয় গোস্বামীর উদ্ধৃতির সূত্রে সাহিত্যপিপাসু ও রবীন্দ্রানুরাগী আবু সয়ীদ আইয়ুব চলমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে দু-চার কথা বলতেই হচ্ছে। পাঠকসাধারণের দপ্তরে প্রেরিত আইয়ুবের বিদগ্ধ সাহিত্যিক বিশ্লেষণে কখনওই শিক্ষাবিদ আইয়ুব প্রতিবিম্বিত হননি। প্রতিবিম্বিত হয়েছেন বিনয়ী ও বন্ধুভাবাপন্ন আইয়ুব। সাহিত্য পাঠ করে আইয়ুব যেটুকু জেনেছেন, সেটুকু তিনি পাঠকসাধারণের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। আইয়ুবের ভাষা ও বিশ্লেষণের ধরন-ধারণে এমন প্রবণতা কখনওই দৃষ্ট হয় না যে, তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় নেমে পড়েছেন। সমালোচক আইয়ুব না, পাঠকবান্ধব ও সাহিত্যপ্রেমী আইয়ুবই বারবার দৃষ্ট হয়েছেন তাঁর পরিশীলিত বক্তব্যের নান্দনিক অবয়বে।

'কবির অভিপ্রায়' থেকে পাওয়া শঙ্খ ঘোষের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বার্তার মাত্র একটা বার্তা নিয়ে দু-চার কথা বলা হল। এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার সেটা হচ্ছে কবির অভিপ্রায় বলতে শঙ্খ ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন। শঙ্খ যা বলেছেন, তার সারমর্ম এটাই দাঁড়ায় যে, কবির সৃষ্টিসম্ভারে তার বাস্তবে যাপিত জীবনের ছায়া কখনও কখনও পড়ে অথবা পড়ে না। কিন্তু, কবির মূল লক্ষ হচ্ছে নান্দনিকতা সৃজন এবং জীবনঘনিষ্ঠ কোনও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠকসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাহলে, প্রশ্ন এসে যায় যে নান্দনিক উৎকর্ষে পৌঁছে যাওয়ার সুদীর্ঘ সড়ক-ভ্রমণে কবি কোন্ বাহনের সহযোগিতা গ্রহণ করেন? উত্তরটা হচ্ছে কবির বাহন তার স্বনির্বাচিত ও সুনির্বাচিত শব্দাবলী, যে শব্দাবলীর মৌলিকতা সন্দেহাতীত। আবারও শরণাপন্ন হচ্ছি কবি জয় গোস্বামীর, যিনি বলেছেন– 'কবিতা একধরনের শিল্পভাষা'। জয়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা আরও কিছু জুড়ে দিতে পারি। সেই আরও কিছু হচ্ছে কবিতার অবয়বে কবির কল্পনা শিল্প হয়ে দেখা দেয়। বিস্মিত ও বিমোহিত পাঠকের মানসকণ্ঠ চমক-প্রাপ্তির আতিশয্যে হঠাৎ বলে ওঠে– 'এমন কল্পনা একমাত্র কবি-ই করতে পারেন!' ঠিকই তো। সন্ধ্যা ও রাতের সন্ধিক্ষণে গল্পকার পাণ্ডুলিপি নির্মাণের আয়োজনে মেতেছেন। সোজা কথায় যেটাকে বলা যায় গল্প লিখতে বসেছেন। লেখার জন্যে তার আলোর প্রয়োজন। আর, একারণেই গল্পকারকে জোনাকিরা আলো উপহার দিচ্ছে। কবি জীবনানন্দের ভাষায়– 'তখন গল্পের তরে জোনাকিরা রঙে ঝিলমিল।'

কবির অভিপ্রায়-এ বাংলা-সাহিত্যের শীর্ষ কবিদের সংশোধন-প্রিয়তা নিয়ে একগুচ্ছ উপভোগ্য বার্তা-কণা উপহার দিয়েছেন নমস্য শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন যে, কবিতা লাগাতার মেধাশ্রম ও লেখন-শ্রমের (brain-labor and pen-labor) যোগফল। পরোক্ষে শঙ্খ বলে দিয়েছেন যে হঠাৎ করে কবিতা জন্মলাভ করে না। কবিতা নির্মিত হয়। শঙ্খ শতভাগ সত্যি বলেছেন। জনৈক ইংরেজ সাহিত্যশিল্পী বলেছিলেন যে, মানসম্পন্ন সাহিত্যশিল্পী হতে হলে মস্ত একখানা waist-paper-basket জোগাড় করতে হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আর ধূসর পাণ্ডুলিপির কবি জীবনানন্দের কলম-বুনোনো (pen-embroidered) কবিতার পাতার উদাহরণ টেনে কবি শঙ্খ ঘোষও এই কথার শিল্পিত পুনরুক্তি করেছেন। হাস্যরসের ছোঁয়া লাগিয়ে শঙ্খ বলেছেন যে, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয়তো রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের কবিতার পাণ্ডুলিপির অবয়বে চোখ বুলিয়ে দারুণ মজা পেতেন আর মনে-মনে এটাও হয়তো বলতেন যে, তাঁর (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) মত পরিশ্রমী কবির সঙ্গে প্রতিভা-শাণিত স্বভাব কবিদের নির্মাণ পদ্ধতি তো অনেকটাই মিলে যাচ্ছে।

শঙ্খ ঘোষের চমৎকার উদাহরণের সূত্র ধরে আরও গুটিকয় উপভোগ্য তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। কবি স্টিফেন স্পেনডার যখন ডিল্যান টমাসের টোয়েন্টি ফাইভ পোয়েম্‌স-এর সমালোচনায় বললেন যে, ডিল্যানের কবিতা জলের তোড়ের মত অনায়াস। স্পেন্ডারের ওপর চটে গিয়ে ডিল্যান তার ভক্ত হেনরি ট্রিসকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন– 'Spender's remark is really the exact opposite of what is true. My poems are formed; they are not turned on like a tap at all, they are water-tight compartments.'

ডিল্যানের ব্যাখ্যা কবি টি এস এলিয়ট-এর ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। এলিয়ট বলেছিলেন– 'Poetry is not a turning loose of emotion.' আবার কবি ডব্লিউ এইচ অডেনও কবিতার বিষয়বস্তুর চেয়ে আকারকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অডেনের কবিতাও তাঁর কারুকৃতিরই উদাহরণ।

খুঁতখুঁতে জীবনানন্দের বিরতিহীন সংশোধন-যজ্ঞের খবরাখবরও এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ড. সফিউদ্দিন আহমদ সংকলিত ও সম্পাদিত কাব্যসমগ্র: জীবনানন্দ দাশ (প্রকাশনা: বিশ্বসাহিত্য ভবন/বাংলাবাজার, ঢাকা) গ্রন্থের সমাপ্তি পর্বের আলোচনা অংশের এক জায়গায় তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত বিবৃতির ভিত্তিতে বলা হয়েছে– 'তিনি (জীবনানন্দ দাশ) কবিতা লিখে একই কবিতাকে সাধারণত চার/পাঁচবার পর্যন্ত সংশোধন করতেন। এই সংশোধন বা পরিমার্জনের নেশা তাঁর এমনই ছিল যে, যে কবিতাকে সংশোধন করে তিনি পত্রিকায় ছেপেছেন, তাকে পত্রিকা থেকে নিয়ে বইয়ে দেবার সময় আবার সংশোধন করেছেন।... কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রেও পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত বারবার বদলাতেন। জীবনানন্দ কবিতা লিখেই সঙ্গে সঙ্গে সে কবিতার নামকরণ করতেন না। পরে একসময় কবিতা সংশোধন বা পরিমার্জনের সময়েই কবিতার নাম দিতেন।'

আলোচ্য পুস্তিকার (কবির অভিপ্রায়) শেষ পর্বে শঙ্খ ঘোষ গবেষক ও সমালোচকদের পাঠকের বন্ধু হয়ে ওঠার জন্যে পরোক্ষে পুনর্বার অনুরোধ জানিয়েছেন। শঙ্খের শিল্পিত অনুনয় আসলেই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কানামাছিরা কখনও-কখনও বর্ণিল ফুলের গায়ে না বসে নোংরা নর্দমার ধারে বসে হাঁপাতে থাকে। দর্পধারী সমালোচকদের সমালোচনায় পঠন-ভ্রমণ চালাতে চালাতে নিরীহ পাঠক কখনও-কখনও কানামাছি বনে যান। ঐ পাঠক অবলীলায় বলে বসেন যে, গজদন্ত মিনারের চূড়ায় যারা বসবাস করেন, একমাত্র তাদেরই কবি আর জীবনানন্দ শুধুই হতাশার কবি।

'কবির অভিপ্রায়' সম্পর্কে দু-চারটে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান বাকি রয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে– রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রে কবি শঙ্খ ঘোষ লেখক-লেখা-পাঠক শিরোনামের বিষয় নিয়ে একদা যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'কবির অভিপ্রায়' ঐ বক্তৃতার ছাপা সংস্করণ। পুস্তিকা-সংস্করণের মুখবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র সরকার। 'কবির অভিপ্রায়' প্রকাশ করেছে কলকাতার প্যাপিরাস প্রকাশনা সংস্থা। বইটির ভারতীয় মূল্য ১০০/- টাকা। ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০৫ এবং ২০১৪ সালে এই বইয়ের পরপর চারটি সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

এমিলি জামান সাংস্কৃতিককর্মী

ছোটগল্প

ব্রহ্মপুত্রের ঘাট

মাহফুজ পারভেজ

খুব দূরেও নয়, আবার কাছেও বলা যাবে না। যাত্রাপথ সাকুল্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের। কোনও বিভ্রাট হলে প্লাস-মাইনাস পাঁচ থেকে দশ মিনিট। যাত্রার সময়ের মত পথের রেখাও ঝকঝকে, স্পষ্ট। কিশোরগঞ্জ থেকে নান্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ হয়ে ডানে গৌরীপুর, নেত্রকোনা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট রেখে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শম্ভুগঞ্জ ঘাট। ট্রেনে এলেও মোটামুটি একই সময় লাগে আর অভিন্ন জনপদগুলো পেরিয়ে আসতে হয়। পূর্ব ময়মনসিংহের এই চিরায়ত ভূগোলে সড়ক আর রেলপথ বলতে গেলে সমান্তরালে চলেছে। শম্ভুগঞ্জের ঘাটের চিত্রটিও আদি আর অকৃত্রিম গুদারা ঘাটের বর্ধিত সংস্করণ মাত্র। পারস্যের বহু ফারসি শব্দের মত গুদারা শব্দটিও দিব্যি টিকে আছে বাংলা অভিধানে। ঘাটে গিজগিজ করছে পূর্ব ও উত্তর ময়মনসিংহের বাসগুলো। গুদারা নৌকায় অপর পাড়ে ময়মনসিংহ শহর। সেখানেও অনেকগুলো ঘাট: থানা ঘাট, এসকে হাসপাতাল ঘাট, পাটগুদাম ঘাট। যার যেদিকে কাজ, সেদিকের গুদারা নৌকায় যাচ্ছে। নদীর অবিরাম স্রোতের মত নৌকা ও মানুষের ছুটে চলা যেন চলছেই অনাদিকাল থেকে। মূক ব্রহ্মপুত্র যার সাক্ষী।

কনক বাস থেকে নেমে নদী ও ওপারের ল্যান্ডস্কেপে আবছা শহরের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়। প্রলম্বিত গ্রীষ্মের তেজি ভাব নেই নদী তীরের জলমগ্ন পরিবেশে। বাতাসে হাল্কা সুখের পরশ ভাদুরে গুমোট গরমকে কিছুটা পরাজিত করেছে। নদী যে কতটা স্বস্তি ও আরামের, তীরে এলে টের পাওয়া যায়। কনকের ভাগ্যে প্রাকৃতিক মোলায়েম পরশ দীর্ঘস্থায়ী হল না। আসা-যাওয়ার বাসগুলোর মধ্যে ঢুকছে আরও নানা রকমের যানবাহন, যাত্রী ও পথচারী। থেমে থেমে শুরু হয়েছে যন্ত্রদানবের পৈশাচিক হর্নের মর্মন্তুদ উল্লাস। কালো ধুম্রকুণ্ডলী পাগলা মোষের মত খোলা আকাশ ও মুক্ত বাতাসকে হনন করছে। ঘাটের কুখ্যাত যানজট, শব্দ ও বায়ু দূষণ, বিশৃঙ্খলার উৎপাত থেকে কিছুটা দূরে সরে কনক একটা অস্থায়ী গোছের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে।

একমুখ হাসিতে মাঝবয়েসী দোকানি আমন্ত্রণের গলায় বলল–'চা আর একটু হাওয়া খেয়ে নৌকায় উঠে পড়ুন। এখনও রোদ কড়া হয় নি, আরামে ময়মনসিংহ শহরে পৌঁছে যেতে পারবেন।'

দোকানির কথায় কনক সৌজন্যে মাথা ঝাঁকিয়ে একই সঙ্গে সম্মতি ও চায়ের অর্ডার দেয়। ঘাটের এদিকে বিশেষ ভিড় নেই। জন কোলাহল, যানবাহনের শব্দ, হর্ন ও ধুম্রজালের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। অদূরে ধনুকের মত উত্তর থেকে বয়ে আসা ব্রহ্মপুত্রকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চলে যেতে। চোখে পড়ল, নদীতে ব্রিজের কাজ চলছে। পিলার বসছে মাঝ বরাবর। কনক ব্রিজের চলমান কাজকর্মের দিকে অনেকক্ষণ স্থির চোখ আকিয়ে আছে দেখে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে দোকানি কথা বলে–'ব্রিজ হলে তো ঘাট থাকবে না। গুদারা, মাঝি, আমাদের মত দোকানদারদের বিপদ হবে।'

কথাগুলো ঠিক কনককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। স্বগতোক্তির মত উচ্চারিত। কনক চুপ করে শোনে। কোনও উত্তর দেয় না। চা শেষ করে ঘড়ি দেখে কনক। প্রায়-আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে এখনও জ্যোতি আসেনি। অথচ আজকে জ্যোতির আসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছে করলেই সে নৌকা ধরে ময়মনসিংহ শহরে চলে যেতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটবে না। তাদের মধ্যে ঠিক করা আছে, এক সপ্তাহে কনক ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শহরে আসবে। পরের সপ্তাহে জ্যোতি আসবে নদী পেরিয়ে শম্ভুগঞ্জে। মফস্বল শহরের ছোট্ট পরিসরে সবাই মুখচেনা লোক। নিয়মিত এক জায়গায় দেখা-সাক্ষাত হলে লোকমুখে সেটি ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। একবার শহরের জনবহুল গাঙিনার পাড়ে কনক ও জ্যোতিকে একসঙ্গে দেখে পাড়ার এক বড়ভাই কটমটে চোখে তাকিয়ে ছিল। ভাগ্য ভাল থাকায় জেরা-জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা ভিড়ের মধ্যে মিশে হারিয়ে যায়। আরেক বার রেল স্টেশনের কাছে তাজমহল রেস্টুরেন্টে চা খেতে গিয়ে প্রায় হাতেনাতে ধরাই পড়ে গিয়েছিল কলেজের মহেশ স্যারের কাছে। সেবারও ভাগ্যের জোরে সটকে পড়েছিল দু'জনে। তারপর থেকে পরিকল্পনা বদলে ফেলে তারা। এক সপ্তাহে কনক শহরে গিয়ে দেখা করে। দেখার জায়গাও তারা বদল করে নিয়মিত। কখনও ছায়াবাণী, পূবরী বা অলকা সিনেমা হলের সামনে। কখনও সার্কিট হাউসের আশোপাশে। কখনও নদীর তীর-ঘেঁষা পার্ক ও রাস্তায় সন্তর্পণে কিছুটা সময় কাটায় তারা। জ্যোতি শহরের বাইরে এলে শম্ভুগঞ্জের আশেপাশে নদীর তীর ধরে নির্বিঘ্নে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয় দু'জনে।

এই সপ্তাহে হিসাব মত জ্যোতি আসবে শম্ভুগঞ্জে। সে রকমই কথা হয়ে আছে। জ্যোতি জরুরি কিছু কথা বলার বিষয়েও আগাম জানিয়ে রেখেছে। কনকেরও বলার মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা জমে আছে। শুধু কথা নয়, দু'জনের ভাগ্যও পাশের ব্রহ্মপুত্রের মত বাঁক বদল করতে চলেছে। কনক পড়তে চলে যাবে পাহাড় ও সমুদ্র ঘেরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। জ্যোতি চান্স পেয়েছে উত্তরের মতিহার ক্যাম্পাসের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রকে সাক্ষী রেখে তাদের আসা-যাওয়া আর মেলামেশারও ইতি ঘটতে চলেছে। তাদের হৃদয়ে মিলনের আকুতি সুতীব্র হলেও দু'জনের জীবনগতির সামনেই অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চিত টান। এই সপ্তাহে দু'জনের দেখা হওয়া তাই খুবই জরুরি। এ কথা কনক যেমন জানে, জ্যোতিও জানে। কনক যথারীতি উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিকে না দেখে সে চিন্তিত এবং কিছুটা বিস্মিত ও শঙ্কিত। জ্যোতি তো কথার হেরফের করার মেয়ে নয়। তাহলে কেন এই বিলম্ব? মাথায় এই আস্ত প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে কনক চা দোকানের বেঞ্চিতে অপেক্ষায় থাকে।

কোন ফাঁকে অপেক্ষার মাঝ দিয়ে কয়েক কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, কনক টের পায় না। টের পেল যখন প্রতীক্ষার টেনশনে ও কয়েক কাপ চায়ের দ্রব্যগুণে পেটে অম্বলের চাপ তৈরি হল, তখন। প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেছে তবু জ্যোতি আসেনি। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কনক আলতো পায়ে মন খারাপ করে নদীর দিকে পা বাড়ায়। ওপার থেকে আসা নৌকাগুলোর দিকে চোখ রেখে রেখে সে তীরে পায়চারি করতে থাকে।

কনক দেখে কত রঙ-বেরঙের মানুষ নৌকায় ব্রহ্মপুত্রের এপার-ওপার করছে। বিচিত্র তাদের বয়স, পেশা, ব্যক্তিত্ব। ছাত্র, ব্যবসায়ী, অসুস্থ, বৃদ্ধ,

ব্রহ্মপুত্র নদ প্রেমে পড়েছে। সে প্রেমে পড়েছে সুন্দরী নদী গঙ্গার। গঙ্গার রূপের গল্প শুনে সে অস্থির হয়ে পড়েছে। যে করেই হোক, গঙ্গাকে তার চাই। ব্রহ্মপুত্র সিদ্ধান্ত নিল, সে গঙ্গাকে বিয়ে করবে। যে-ই ভাবা সে-ই কাজ। গঙ্গাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হতে থাকল সে। ওদিকে গঙ্গাও ব্রহ্মপুত্রকে পছন্দ করেছে। কিন্তু পছন্দ করলেই তো হবে না। ব্রহ্মপুত্র কি সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসে, সেটা যাচাই করে দেখাও দরকার। তাই গঙ্গা এক অভিনব বুদ্ধি বের করল। সে তার রূপবতী অবয়বে বৃদ্ধার সাজ নিল।...

কুলি, কামলা, হকার রোগি, নারী, পুরুষের অভাবনীয় এক জগৎ তৈরি হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের ঘাট ঘিরে। এখানেই একদিন জ্যোতির সঙ্গে কনকেরও দেখা হয়ে গিয়েছিল। এক অসুস্থ আত্মীয়কে নিয়ে কনক নেমেছিল শম্ভুগঞ্জের ঘাটে। গুদারা নৌকায় চেপে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছতে অস্থির ও ব্যাকুল কনককে দেখছিল সহযাত্রীরা। কনক আগে ময়মনসিংহ শহরে আসেনি। সে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিচ্ছে জীবনে প্রথমবারের মত। তা-ও একা এবং একজন সঙ্কটাপন্ন মানুষকে নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে সে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পাশের কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চেয়ে বিশেষ লাভ হয় নি তার। অকস্মাৎ উদ্বিগ্ন কনক অবাক হয় একটি তরুণীর কণ্ঠস্বরে– 'চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেব।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমাকে পথঘাট বলে দিলেই আমি পারব।'

'আমার কষ্ট হবে না। আমি ওদিকেই থাকি।'

মাঝ নদীতে কনক যে মেয়েটির কথায় আশার দ্বীপ খুঁজে পায়, তার নাম জ্যোতি। জ্যোতির কারণে নতুন শহরে আগন্তুকের মত একেলা ও অসহায় কনক স্বচ্ছন্দ্যে সব কাজ করতে পারে। রোগি ভর্তি থেকে চিকিৎসার যাবতীয় কাজে না বললেও জ্যোতি পাশে থাকে। রুটিন করে দিনে দুইবার হাসপাতালে চলে আসে জ্যোতি। বারণ করলে বলে–'ঐ যে আমাদের বাসা দেখা যায়। দুই মিনিটের পথ। বার বার এলেও আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

হাসপাতাল থেকে রিলিজ নেওয়ার দিন জ্যোতি সারাক্ষণ পাশে থাকে। শহরের প্রান্তস্পর্শী ব্রহ্মপুত্রের ঘাট পর্যন্ত সঙ্গে আসে। নৌকায় বসে কনক দেখে পাড়ে তখনও দাঁড়িয়ে জ্যোতি। হঠাৎ নিজের ভেতরে অকস্মাৎ পরিচিতি মেয়েটির জন্য অজানা-অচেনা কেমন একটা টান অনুভব করে কনক। মনে হয় ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সে একটি স্বল্প পরিচিত তরুণীর সঙ্গে যৌথ সাঁতারে। নৌকা ছাড়ার আগে কনক হঠাৎ চিৎকার করে বলে– 'শুক্রবার আমি আবার আসব তোমার কাছে।' হাল্কা মাথা নাড়িয়ে সলাজ মুখ লুকায় তীরে দাঁড়ানো জ্যোতি।

সেই শুরু। তারপর দেখতে দেখতে দুই বছর হয়ে গেছে। বিশেষ কারণ ছাড়া কোনও সপ্তাহেই তাদের দেখা-সাক্ষাৎ বাদ যায়নি। আজকে জ্যোতির দেখা না পেয়ে পুরনো কথাগুলো মনে হয় তার। জ্যোতির দেখা না-পেয়ে কনকের মনে হল, উত্তরের গারো পাহাড় কাছে চলে এসে বেদনার প্রচণ্ড ভারে তাকে চেপে ধরেছে।

কনক ঠিক বুঝতে পারে না, কেন জ্যোতি আসেনি? এমন তো কখনও হয়নি। বিশেষ করে, এবারের দেখাটা অনেক জরুরি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তাদের মধ্যে হওয়া দরকার। কনক দেখে দুপুরের সূর্য মাথার উপর গনগন করছে। ব্রহ্মপুত্রের জলজ বুকে রুদ্রদিনের দাবদাহে বাষ্পের আবছা ছায়া দৃষ্টিতে বিভ্রম ছড়াচ্ছে। সে নিজেও কম বিভ্রান্ত নয়। তার বুকেও চলছে আগুনের হল্কা। কনক স্থির করতে পারে না, তার কি চলে যাওয়া উচিত? নাকি ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে যাওয়া দরকার জ্যোতির কাছে?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নৌকা ধরে শহরে চলে আসে কনক। বেশ খিদেও পেয়েছে তার। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে সে চলে আসে সেহরা, আকুয়া পেরিয়ে জ্যোতির বাসার কাছাকাছি। জ্যোতির বাসা চিনলেও কোনওদিন সেখানে তার যাওয়া হয়নি। একবার শুধু বড় রাস্তা থেকে জ্যোতি দেখিয়েছিল তাদের হলুদ বাড়িটি। আন্দাজে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক সময় কাটিয়ে বিকেলের মুখে কনক জ্যোতিদের বাড়ির ঠিক সামনে পৌঁছে যায়। পুরো আবাসিক এলাকায় সারিবদ্ধ বাড়িগুলো দেখতে পায় সে। কোনও দোকান-পাট নেই যে দাঁড়িয়ে দেখবে বা কিছু খোঁজ-খবর করবে। জ্যোতির বাসার পাশে তার চোখে পড়ে গেটের ভেতরে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়ানো। লোকজনও চলাচল করছে। অন্য বাড়িগুলোর মত নিশ্চুপ ঝিমুচ্ছে না জ্যোতিদের বাসা। বাসার আরেক পাশে একটি ল্যাম্পপোস্টের তলায় তিনটি ছেলে জটলা করছে। কনক ধীর পায়ে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। সে স্পষ্ট শুনতে পায় তাদের কথোকথন–'খুব ভাল বিয়ে হয়েছে জ্যোতির। যদিও কাজটা হয়েছে ওর অসম্মতিতে জোর-জবরদস্তি করে।'

চট করে এক পলকের জন্য থমকে দাঁড়ায় কনক। পেছন ফিরে ছেলেগুলোর মাথার উপর দিয়ে তীর্যক দেখতে পায় জ্যোতিদের বাড়িটি যেন নিমেষে কারাগার হয়ে গেছে। সামনের দিকে ফিরে পা বাড়ানোর আগে কনক শুনতে পায় ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ একজনের গলা– 'জ্যোতিকে আর দেখতে পাব না। কালই বরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে সে।'

যন্ত্রের মত কখন যে কনক প্রাচীন ময়মনসিংহ শহরের অলি-গলি পেরিয়ে পুরনো ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে চলে আসে, বুঝতেও পারে না। বোধশক্তিহীন মানুষ এখন সে। অভ্যাসের বশে সে চিনতে পারে ঘাট, গুদারা, নৌকা, ব্রহ্মপুত্র, জ্যোতির মুখের স্মৃতি। চিনলেও সে যেন কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না। নিজেকে তার মনে হয় খুবই একা ও অচেনা এবং পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম মানুষের মত সঙ্গীহীন। নদীর তীর থেকে কেউ একজন তাকে ধরে নৌকায় বসিয়ে দেয়। চরাচর জুড়ে প্রদোষের আবির রঙা বেদনায় কনক ব্রহ্মপুত্রে জলে তাকিয়ে চমকে উঠে। কনক দেখে, ব্রহ্মপুত্র নিজের চেহারা লুকিয়ে জলের কল্লোলে তার নিজের চেহারাই বিম্বিত করেছে। নদীর স্রোতে তাকিয়ে কনক বুঝতে পারে, তার আর জ্যোতির জীবন প্রবাহ যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

পুরনো নদীর বুকে জন্ম নেয়া একেকটি বালুচর পেরিয়ে কনকের নৌকা শম্ভুগঞ্জের ঘাটে ফিরে আসার সময় তার খুব জানতে ইচ্ছে করে, এইসব বালুচরের ওপর শুয়ে স্বপ্ন দেখা তরুণ-তরুণীর কথা ব্রহ্মপুত্র মনে রাখবে? তাদের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যাগুলো মনে রাখবে শম্ভুগঞ্জের ঘাট?

কোনও এক অনিন্দ্য ভোরে হঠাৎ শম্ভুগঞ্জের ঘাটে ব্রহ্মপুত্রের কাছে এসে একদিন কনক জেনে নেবে এইসব প্রশ্নের উত্তর।

পাদটীকা

ব্রহ্মপুত্র নদ প্রেমে পড়েছে। সে প্রেমে পড়েছে সুন্দরী নদী গঙ্গার। গঙ্গার রূপের গল্প শুনে সে অস্থির হয়ে পড়েছে। যে করেই হোক, গঙ্গাকে তার চাই। ব্রহ্মপুত্র সিদ্ধান্ত নিল, সে গঙ্গাকে বিয়ে করবে। যে-ই ভাবা সে-ই কাজ। গঙ্গাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হতে থাকল সে। ওদিকে গঙ্গাও ব্রহ্মপুত্রকে পছন্দ করেছে। কিন্তু পছন্দ করলেই তো হবে না। ব্রহ্মপুত্র কি সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসে, সেটা যাচাই করে দেখাও দরকার। তাই গঙ্গা এক অভিনব বুদ্ধি বের করল। সে তার রূপবতী অবয়বে বৃদ্ধার সাজ নিল। বৃদ্ধা গঙ্গা অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা এবার এগিয়ে গেল ব্রহ্মপুত্রের দিকে। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র তার দীর্ঘ যাত্রা শেষে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বৃদ্ধা গঙ্গাকে চিনতেই পারল না। চিনবেই বা কেমন করে, গঙ্গা তো তখন ছদ্মবেশী বুড়িগঙ্গা। কৌতূহলী ব্রহ্মপুত্র বুড়িগঙ্গাকে শুধাল, 'মা, গঙ্গা কোথায়?' বুড়িগঙ্গা এই প্রশ্নে ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। গঙ্গাকে চিনতে না পারার মাশুল দিতে হল ব্রহ্মপুত্রকে। গঙ্গা তাকে ফিরিয়ে দিল। ব্রহ্মপুত্র তারপর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেল। নাম আড়াল করে গঙ্গাও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সাগরে হারিয়ে গেল। একই সাগরে মিলেমিশেও কেউ কাউকে চিনতে পারল না।

ড. মাহফুজ পারভেজ শিক্ষাবিদ, কবি-গল্পকার

বাদল ঘোষের কবিতা

মানুষ

সামনে পেছনে চতুর্দিকে থই থই চেনা আর অচেনা মানুষ
খুঁজি তবু সারাক্ষণ!

চোখ নাক মুখ অবিকল মানুষের
কী যেন পাই না তবু খুঁজে–
এই চর্ম চোখে অধরাই থেকে যায়!

পশুদের চেহারায় ও স্বভাবে আছে বেশ মিল
কুকুরেরা করে ঘেউ ঘেউ বেড়ালেরা মিউ মিউ
বাঘের গর্জনে কেঁপে ওঠে অন্তরাত্মা!
অথচ মানুষ!

চশমার সুদৃশ্য ফ্রেমের আড়ালে
লুকানো চোখের ভাষা
যায় না সঠিক পড়া–
দুর্বোধ্য আদিম তাম্রলিপি!
অথচ বনের পশুদের নেই কোন বর্ণমালা

সভ্যতার কৃত্রিম পলিশ পেয়ে
মানুষেরা আজ শোকেসে সাজানো
ডায়মন্ডের সমূহ নেকলেস তবু হার
মানে!

চতুর্দিকে থই থই অজস্র মানুষ;
বুঝি না যে তবু কে আসল
কে আর নকল!

তারচে' সবাই আসুন না
নিজকেই নিজে কঠিন জিজ্ঞাসা করি...

আরেক জনপদের কোলাহল

বরাবর আমি জল আর অগ্নি পাশাপশি রেখে হেঁটেছি সুদুরে;
অবশেষে মহান এশিয়া থেকে
উত্তর আমেরিকার আরেক প্রসিদ্ধ জনপদে

নবীন জনপদের অপরূপ কোলাহল
জেগে ওঠে সমূহ চেতনা!
স্বার্থক সঙ্গমে জেগে ওঠে নারী
জেগে ওঠে পুরুষ যেমন!

নপুংসকেরা শুধুই ব্যর্থতার চরম গ্লানিতে
জ্বালায় হিংসার গণগনে মশাল।

চোখের সম্মুখে আচমকা খুলতে থাকে
রঙচোরা সব মেকি পর্দা

চতুর চোখের লেন্সে আমি ক্রমাগত
ফটোস্যুট করি আনকোরা সমূহ
বিচিত্র বর্ণিল দৃশ্যপট
পায়ের পাতায় মৃত্তিকার স্বাগত চুম্বন

পঞ্চেন্দ্রীয়
আমার ক্রমেই অভ্যস্ত হতে থাকে
ভিন্ন স্বাদ গন্ধ রূপ রস আর নতুন শব্দমালায়
বিচিত্র এ দৃশ্যাবলি বিচিত্র মানুষ
অপূর্ব মোহন বিচিত্র এ কোলাহল!

বহুবর্ণিল তরতাজা সদ্যোজাত লাফানো মাছের ছবিগুলো
এক এক করে করি সযত্ন পরখ,
নিখুঁত বাছাই
অতঃপর তুলনামূলক এক জটিল বিচার
আমার মনুষ্য এই জন্ম আর এত জন্মান্তর!

এক থেকে আরেক নবীন জনপদে

তবে কী সে আমি নই– আমার নশ্বর ছায়ায় বিচিত্র রূপান্তর!

ভিন্নতর এক কোলাহল থেকে আরেক দঙ্গল কোলাহলে–
জেগে ওঠে আণবিক ভঙ্গুর শরীর;
আত্মার গভীর মহান প্রদেশে
ডেকে যায় চিরচেনা ঐ ফেরিওয়ালা;
ধূলিমলিন পথের বর্ণিল রেখায়
অলক্ষ্যে চিত্রিত হয় কৈশোরের
অমোঘ আনন্দ আলপনা

আবার অমল সেই আলপনা ধরে
সটান হাঁটতে থাকি জন্ম-জন্মান্তর
ক্রমেই সমূহ মহাদেশগুলো বুকের খাঁচায় পুরে
অবশেষে উত্তর আমেরিকার আরেক অবাক জনপদে!

আমি কী আগেও এখানে ছিলাম
কোন্ এক অতীত জনমে!

মানুষ কোথা সব পশুখামার

গাফ্‌ফার মাহমুদ

মানুষ পশু পোষে; পাশবিকতায় পর্যবসিত পাষণ্ডহৃদয়
বুকে দারণ করে কুপমণ্ডুক নির্দয় তাবৎ পশুস্বভাব
ক্রমাগত ক্ষয়জাত হৃদয়চূড়ো বিদীর্ণ হয় একেবারে
ভুলতে ভুলতে ভুলে যায় ভেতরের স্বয়ং মানুষ হৃদয়!

অসহায় মাতাকে রেখে আসে অনাথপুর বৃদ্ধাশ্রমে
পশুপোষা মানুষ বিড়াল-কুকুরের গড়ে তোলে স্বর্গধাম
কী আশ্চর্য, ইদানীং মানুষ মানুষের তফাৎ বিস্তর!

আমরা কেমন মানুষ, ভেতরে ভেতরে গড়ে তুলি
খুব যত্নে পশুখামার বুকে ও মনে সঙ্গোপনে...

মিতুল সাইফের কবিতা

আর পাঁচ মাথা সাপ

গোহাটের মজমায়
পাঁচ মাথা অলা সাপ দেখব বলে
হাতের বাঁধন খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
বেওয়ারিশ লাশের মত পচে গলে
তবুও অপেক্ষা।
কর্পোরেট বিশ্ব গণতান্ত্রিক সভ্যতা
প্রযুক্তি প্রগতি
নতুন বস্তায় পুরনো গমের
গন্ধ শুঁকিয়ে আবেগে উল্লাসে বিভোর।
কপালের ঘাম জমিন ছুঁয়েছে,
কী হ'ল ? দেখান–
পাঁচ মাথা সাপ কই?

রোদ ঢুকেছে অন্ধকারে

রোদ গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকে পড়ে অন্ধকারে
ভিজে ভিজে পথে সহসা হোচট খায় সুখ
ডানা ঝাপটায় টানাপোড়েনের সংসার
অবিরাম স্মৃতির শ্যাওলা আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখে পথ।
পথের পথিক পথ ছেড়ে যায় বৈপথে বৈরথে।

দিদি আমি সেই বাড়িতেই আছি

দিদি, আমি সেই বাড়িতেই আছি।
সেই খাট, সেই নীল বিছানায়
সেই জানালায় আমার দু'চোখ
আটকে থাকে অহর্নিশ।
সেই বেদনা ঘুরপাক খায়
আমার ফুলের টবে।
যদি তোর সময় সুযোগ মেলে
একবার আয় ফুলেদের মেয়ে।
অভিমান খুব বড় হয়
জাল পাতে সব ইচ্ছেগুলো।
হাত গুটিয়ে তবুও থাকে
বিরান মাঠের উল্টো পরিস্থিতি।
দিদি, আমি সেই বাড়িতেই থাকি।
সেই দেয়ালের আস্তরণে
কাব্য লিখি
চুন খসে যায়
ইট খসে যায়
মন জখমের পাল্লা চলে রোজ।

ভজন সরকারের কবিতা

পথগুলো অচেনা

১.
এক সময় পথগুলোও অচেনা হয়
হারিয়ে যায় বেপথে বেভুলে।
কতদিন ছিল পথের পাথরের ভয়
কতদিন ছিল না পথের পাথেয়
কতদিন ছিল পথের ওপারের মুখ
উদ্ভাস চোখ আর প্রতীক্ষার অবসান।
সময় ক্ষয়িষ্ণু জানতাম, কিন্তু পথ?
একদিন পথও শেষ হয়, পথিকের সাথেই...

২.
ভালবাসলে খুব কাছে থাকতে হয়, হয় নাকি?
পাথরের ঠোকাঠুকি তবে কি বাতাসের সুর থেকেও সুরেলা?
অগণন দূরের নক্ষত্র, কোনওদিন না-পরা নাক ফুল
কোনওদিন দেখিনি সেই তুমি, তোমার উষ্ণতা
যে হাতে লাগেনি স্পর্শ, যে চিবুকে মমতার ছোঁয়া
কোনও এক অচেনা ক্যাফের আলতো বিদ্যুৎরেখা
কফি কাপের উত্থিত ধোঁয়া; শুধুই কি উষ্ণতা?
কতদিন দূর থেকে অপেক্ষা, তারপর এক ঝুমবৃষ্টি
কতদিন মেঘের সাথেও মাটির চেনাজানা ছিল না...

কফির চুমুকে তুমি

তোমার সাথে গ্লোরিয়া জিন্স
তোমার সাথে নর্থ এন্ডের কফি
তুমি তখন পাইন উডে– আমিও সাথে
কফি বিনে কফির গন্ধ শুঁকি।
হঠাৎ সেদিন আকাশ দেখার শখ
ট্যাগোর টেরাস তুমিও সেদিন পাশে
শেফ টেবিলে তোমার মুখোমুখি
মাছ পাতুরির স্বাদ এখনো আসে।
তোমার কী চাই? এসপ্রেসো? না, ল্যাটো?
নাকি তুমি আদ্দি আমেরিকানো?
আমি ছিলাম মকা চিনোর পোকা
এখন কিন্তু আমিও ক্যাপাচিনো।

তুমি নববর্ষ বলে ডেকো

দুলাল সরকার

'তুমি আমাকে নববর্ষ বলে ডেকো'– এই বলে
চন্দনের সব চিহ্ন মুছে ফেলে দেহের সর্বত্র
তুমি নববর্ষ লেখ, –কোথাও নেই এতটুকু ফাঁক
শুধু লেখ ভোরের বটমূল আর ছায়ানট প্রবর্তিত
বাঙালির চিরন্তন ভোরমুগ্ধ শস্যনীল পাথারের
মা-মা ঘ্রাণ– ফুটে ওঠা মানুষের হাতের অলীক
চিরায়ত দেহের ভাঁজে থোড় উঁকি শস্যের অস্ফুট গুঞ্জন;

এই শুভ দিন, জালি ও শ্যামল অঙ্গে শ্যাম আভা
জলের প্রজাতি, পাখিনীর এত প্রিয় অভিমান
লিখেছ আমার প্রিয় শালবীথি, উদয়ন
শান্তিনিকেতনের আকাশে ওড়া 'বউ কথা কও' পাখির বিলাপ ;
আহা, অজয়ের তীরে হাঁটা উদাসীন বাউল বাউলী– সেই
পাখিদের পক্ষপাত দেখে পাখি হয়ে জন্মানোর
আমার বিশেষ সাধ– আমাকে তোমার করে
পাবার বিশেষ ক্ষণ, হিজলের ধুলো পথ– সাম্যবোধ,
কখনও কখনও মানুষ কিছুই বোঝে না এরকম চুপ-বেলা
অভিভূত মুহূর্তের অশেষ প্রার্থনা
তুমি লিখে রেখ নববর্ষ তোমার শরীরে
আর সেই বিদগ্ধ বকুল তোমার উন্মুক্ত বুকে লুকিয়েছে মুখ।

ছোটগল্প

মতবাদের দায়

আসিফ কবীর

চেয়ারম্যান মাওকে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার জের-রেশ এখনও কাটেনি। এমনই দিনে আমার মত বামপন্থাকে আঁকড়ে খুব কম মানুষই আজকাল বাঁচছে এ দেশে। অন্তত আমার এমনটাই মনে হয়। তবু চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের নামে আমার জীবনটাও অনেকের মত তছনছ করা হয়েছিল একদিন। আমার ইচ্ছা ছিল ভাল পড়াশোনা শিখে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হব। আমার মত শিক্ষার্থীদের সামনে চেয়ারম্যান মাও-কে ক'জন তুলে ধরতে পারতেন? আমার মত জার্নালে বা সিম্পোজিয়ামে ক'জন ভালবেসে তাঁর চেতনা, বিশ্বাস, দর্শনকে সামনে আনতে পারতেন? কিছুই হল না তার। আর তা সম্ভব হল না চেয়ারম্যানকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহারের জন্য। এটাই আশ্চর্য।

আমি তখন অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। প্রথম সামাজিক গবেষণা পড়ছি। কিছু খটোমটো তো বটেই বিষয়টা। ছুটিতে বাড়ি আসার আগেই ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেছে। দিন দু-একের মধ্যেই রওনা হয়ে যাব খুলনায়। এমন অবস্থায় যোগাযোগ করে গেলাম কোর্স শিক্ষক ড. গীতি আরা নাসরীনের বাসায়। কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিউমার্কেটের কাছে কোয়ার্টার তখন তাঁর। তিনি সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির বিষয়টির খটকাগুলো মিটিয়ে ভালই শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন। অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতিটা সবচে' মনে ধরল। অংশগ্রহণকারীরাই তাদের সুবিধা-অসুবিধা বলবেন। সমাধান খুঁজে নেবেন। যাপিত জীবনের চেনাজানা জগতের সম্বন্ধে তো তারাই সবচে' ভাল মূল্যায়ন করতে পারেন। আরও বুঝলাম গবেষণা কোনও আবিষ্কার নয়, এটা জরিপের ফল। গবেষক নিজেও ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারেন। আবার উত্তরপত্রে দেওয়া উত্তরগুলোও বস্তুনিষ্ঠ না-ও হতে পারে। এগুলো অবশ্য গীতি ম্যাডাম বলেননি। আমার মত করে বুঝে নিলাম। ওই দিনই মাও সেতুঙের মেটালিক ইমালশনের দাঁড়ানো ভঙ্গির দ্যুতি ছড়ানো ঘরে রাখা ভাস্কর্যটি প্রথম দেখা আমার। এক ফুট-সোয়া ফুট উচ্চতার, টি টেবিলে রাখা। কপার ইমালশন, লালাভ ধরনের। চীনা কাণ্ড, আসলে তো তামা না। প্লাস্টার অফ প্যারিসে গড়ে মেটালিক ইমালশন করা। তবু দারুণ। গোল করে কোণা কাটা গলাবন্ধ জামার কলারের লুকটা আনা। আর চেয়ারম্যান মাও যেমন দেখতে তেমনই গড়ন, মুখাবয়ব। মনে ধরে থাকার মত, থেকেছেও তাই। সে ২০০৩ সালের কথা।

২০০৪-এ আমার বাবাকে হত্যা করা হল। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হত্যাকাণ্ড। আমার পড়াশোনা দায়সারা হয়ে গেল। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ব্যস্ত হয়ে যেতে হল। ছাপাখানার মেশিন সস্তায় কিনে কোনওরকমে জীবন চালিয়ে নিতে মাওয়ের চীন দেশেও যাওয়া হল। মূল ফোকাস মেশিন দেখা, পড়তা হলে কেনাও। এর ফাঁকে একবার পার্ল মার্কেট নামে ছাপোষা মানুষ আর ট্যুরিস্টদের মার্কেটেও যাওয়া হল। সেখানে এক ছাদের নিচে ছোট ছোট পসরা সাজানো– দোকানি টেবিল বা চৌকির পেছনে বসে বা দাঁড়ানো। একটু অর্গানাইজড ফুটপাতের দোকান আরকি। ঘুরতে ঘুরতে একদিকে মাও সেতুঙের সেই ঘরে রাখার জন্য বেশ বড়সড় পূর্ণাঙ্গ অবয়বের ভাস্কর্য পেয়ে গেলাম। কিনে আনতে তো মন চাইলই। মনে পড়ে গেল সাম্যবাদের সবচে' বড় শিক্ষা: তোমার সামর্থ্য মত কাজ করবে, প্রয়োজনমত প্রতিদানে পাবে। মানে হল খাটতে বা উৎপাদন করতে হবে যার যেমন সাধ্য, তার সবটুকু নিবেদন করে। এরপর তা জড়ো হবে এক স্থানে। সেখান থেকে দেওয়া হবে যার যেমন প্রয়োজন জীবনে চলার জন্য। কানে বাজতে লাগল নকশালপন্থীদের স্লোগান: চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান। যদিও নকশালপন্থীদের প্রতি আমার সমর্থন-সহানুভূতি প্রগলভ নয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকে তারা অকেজো মত করে দেওয়ায়।

শ্রীমতী গান্ধীর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান তো অবিস্মৃত ব্যাপার। আর বাঙালির চিরদিনের অভিভাবক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই অমোঘ কৃতজ্ঞতা মেশানো উক্তি, 'আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার সেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম দু'দিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই চেষ্টা করেন নাই– আমাকে রক্ষার জন্য'– রাজনৈতিক ইতিহাসে মার্কসবাদ প্রভাবিত যে-কোনও গান, কবিতা, স্লোগানকে ছাপিয়ে যায়।

যাহোক, হাতের নাগালে পেয়েও মাও সেতুঙের অমন সুন্দর ভাস্কর্যটি নেয়া হল না। দাম পর্যন্ত করা হল না। মন সায় দিল না। কাঁচা শোক বাধা হয়ে দাঁড়াল। কারণ, ওরাও যে তার প্রতিকৃতি দায় স্বীকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দিয়েছিল। আমি দেখেছিলাম। নিজ চোখে। না দেখে ফেললে অন্য ব্যাপার হত।

এরপর দিন গড়িয়েছে। আরও বন্ধুবান্ধব চীন দেশে গেছে, যাবার আগে সৌজন্য করে বলেছে, কী আনব। আমি লজ্জা না করে বলেছি, মাও সেতুঙের ঘরে সাজিয়ে রাখার মত একটি ভাস্কর্য। মনে মনে বলেছি, যা আমি বিশেষ কারণে আনতে পারিনি। ফেলে এসেছি। বন্ধুস্থানীয় একজন সেনা কর্মকর্তা এবং একজন আমলা পরপর দুই বছরে চীনে গেছে প্রশিক্ষণে। আমার মনের মধ্যে থেকে যাওয়া ছবির অবিকল মাও-এর ভাস্কর্য না নিয়েই ফিরে এসেছে। যা এনেছে অতি ক্ষীণকায়, বাচ্চাদের খেলনা সৈন্য সেটের বড় সাইজের অনুরূপ। চার থেকে ছয় ইঞ্চির বেশি না। যদিও একটি থেকে আরেকটি ইঞ্চি দুয়েক বড়। কিন্তু কোনওভাবে আমার মনমতটি না, রংও ভিন্ন, গোল্ডেন ইমালশন করা। মনে অপূর্ণতা থেকে যায়। এরপর আরেক পরিচিত সেনা কর্মকর্তা, আমাদের খুলনার ছেলে, ডাকনাম উপল গেল, অস্ত্র কিনতে সরকারিভাবে। সে-ও যথারীতি বলল, আসিফ ভাই কী আনব? আমিও যথারীতি বলি, মাও সেতুঙের মূর্তি। উপলের সুযোগ ছিল, যেহেতু সে অস্ত্র কিনতে গেছে, সে ভেন্ডরকে লাগিয়ে দিল, ভেন্ডর খুঁজেটুজে আসল পিতলের আবক্ষ মূর্তি এনেছিল। দামও বেশি খানিকটা। তবু মন ভরল না। সাজিয়ে রাখলাম বসার ঘরে, যাতে নজর কাড়ে অভ্যাগতদের। একবার মাত্র বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ভারতীয় এক বন্ধু সাজানো আর্টিফ্যাক্টটি দেখে মুখে কিছু না বললেও খুশি যে হননি, বরং তাঁর ইস্যু নিয়ে মন খুলে আলোচনা করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, তা ঠিকই বুঝলাম। যাহোক, মাও সেতুঙের আবক্ষ মূর্তিটি থেকে গেল গরিমা নিয়ে।

এরপর আমার সুযোগ হল দ্বিতীয়বার চীন দেশে যাওয়ার। ২০১৫ সালে। আমার পিতার হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে এরই

মধ্যে। শোক-সংক্ষোভ এতদিনে প্রথম কয়েক বছরের মত যুক্তি অগ্রাহ্য নেই। আবার গেলাম পার্ল মার্কেটে। গিয়ে অনেক খুঁজতে হল মাও-এর কোনও মূর্তি পেতে। মনে হল 'মাওবাদ'কে তুলে ধরতে খোদ চীন দেশেরই আগ্রহ কমে আসছে। অবশেষে সেই ভাস্কর্য পেলাম, তবে এবার তা চীনা ঐতিহ্যিক পোরসেলিনের, যা আমরা বলি চীনা মাটিতে গড়া। শ্বেত-শুভ্রতায় প্রভাময় চেয়ারম্যান মাও সেতুং। স্টাডি টেবিল বা বইয়ের তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে মোক্ষম। বাংলাদেশি আটশো কি এক হাজার টাকায় কিছুটা দরদাম করে কিনে নিলাম। দুটি ছিল দোকানির সংগ্রহে, একটি আমার হয়ে গেল। তেমন বেশি দোকানে না তোলার কারণ মনে হল চীনাদের চাহিদা একদমই নেই। আমার অপরাপর তিন বন্ধুও কয়েক বছর আগে যারা এসেছিল, ফিরে গিয়ে বলেছিল অনেক খুঁজতে হয়েছে তাদের মাও সে তুঙের স্মারক, চীন দেশেই। প্রকৃতি যেমন অপব্যবহারে বিরান হয়, অনিয়ন্ত্রিত আহরণে বিরূপ হয়, অযত্ন-উদাসীনতায় বিনষ্ট হয়, মনে হল চেতনা বা মতবাদও তাই হয়। আমরা মাওকে কত না ভুলভাবে ব্যবহার করেছি, যত্রতত্র মাওবাদকে প্রয়োগ করেছি শুধু যার যার লাভালাভ মেটাতে। রাজনীতিকীকরণ হয়েছে উপমহাদেশে যথেচ্ছভাবে, আজও হচ্ছে। ঠিকভাবে জেনে না জেনে। আমি ড. গীতি আরা নাসরীনের বসার ঘরে যেমন মাও সেতুংকে দেখে মনের অর্গলে আটকে রেখেছি, অস্বীকার করার তো উপায় নেই, মাওকে তো দেখেছি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এমএল জনযুদ্ধের যাবতীয় হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে প্রেরিত প্রেস রিলিজের লেটার হেডেও।

এই শতকের প্রথম দশকে যখন গীতি ম্যাডামের বসার ঘরে মাওকে দেখেছিলাম তখন আবেগ ও ভালবাসায় সঙ্গতই খোঁজ নিয়েছিলাম আরও। জানতে পেরেছিলাম তাঁর স্পাউজ, যিনি প্রশিকার গবেষণা কর্মকর্তা, সংগঠনটির একজন স্তম্ভকর্মী, মাওবাদের প্রতি অনুরক্ত জেনে চীন থেকে কেউ মাও-এর ভাস্কর্যটি এনে উপহার দিয়েছেন। আমরা খবরের কাগজ থেকে জেনেছিলাম, তখনকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ৩০ এপ্রিল ২০০৪-এর ট্রাম্পকার্ড ও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পতন দামামা বাজানোর সহযোগী প্রশিকা, সেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কয়েকজন মূল কর্তাব্যক্তির সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন ম্যাডামের স্বামীও। দৈনিক জনকণ্ঠে যেদিন তার গ্রেপ্তার মুহূর্তের ছবি ছাপা হয়, সেই ঋজু ভঙ্গিমার ছবি দেখে সেমিনার কক্ষে উচ্ছ্বসিত এক ছাত্রী বলেও ফেলে, 'ম্যাডামের স্বামী খুবই জোয়ান তো!' পরের মুহূর্তেই এই ছাত্রী নিজের কথার জন্য নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়। আমরা ক্লাসের মার্কসবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিতরা সে কথারই অর্থ করে নিই এভাবে, ছাত্রীটি বলেছে, 'তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত।' জেল-জুলুমেরও একদিন অবসান হয়। তিনিও জামিন পান। ২০০১ সালে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠনের অগণন ঘটনা নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ ও উপাত্ত সংগ্রহের অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে চার্জ গঠিত হয়ে মামলা চলমান থাকে। এমনি একজন মানবিক বোধসম্পন্ন, কর্তব্যে অবিচল মানুষের প্রিয় চেয়ারম্যান মাও সেতুং, আমার মত অনেক তরুণের আবেগ-উচ্ছ্বাস ঘনীভূত হয়ে আছে যেখানে। সাম্যবাদী চিন্তা ও সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ মাও। সবাই খেয়ে-পরে-স্বাস্থ্য সুরক্ষা-আবাসন ও শিক্ষাসুবিধার নাগাল পাবে যে ব্যবস্থার আওতাধীনে, এরচে' ভাল আর কী হতে পারে!

মাও সেতুং বের করেছিলেন লাল পকেট বই। এটা ভাইনাল প্লাস্টিক জ্যাকেটের জলরোধী মোড়কে বাঁধাই করা হত। ছোট বইটি আদর্শের প্রশ্নে একটি সার্বক্ষণিক গাইডলাইন। ১৯৬০ সালে পৃথিবীর ৩০০ কোটি জনসংখ্যার বিপরীতে ১০০ কোটি কপি ছাপা হয়েছিল। পৃথিবীর ৫০টি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। আর আজ অবস্থা এমন যে, চীনে ট্যুরিস্ট এলাকায় স্যুভেনির হিসেবেই কেবল এই বই পাওয়া যায়। সবখানে না।

মাও সেতুংয়ের দর্শন সহজভাবে সবার কাছে না পৌঁছানোয় চূড়ান্ত অপব্যবহার হয়েছে। তৈরি হয়েছে গাঢ় মানবিক সংকট।

আমার বাবাকে হত্যা করা হল। দিনদুপুরে, নিজের অফিস কাম বাসগৃহের সামনে। দায় স্বীকার করে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল, তিনি বুর্জোয়া। কেউ একজন আমাকে বলেছিল, ...সে কথা বলতে চাই না, কী বাজে কথা, বলা হয়েছে তিনি 'বাজুয়া'। বুঝতে পারি 'বুর্জোয়া' শব্দটির সাথে পরিচয় নেই তার, তাই সঠিকভাবে মনে রাখতে পারেননি। মোংলার কাছাকাছি একটি স্থানের নাম 'বাজুয়া'। স্মৃতিপটে পরিচিত স্থানটির নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে, 'বুর্জোয়া' আড়ালে চলে গিয়ে। একজনের বুর্জোয়া হতে গেলে যে সম্পদ প্রয়োজন, তা আমাদের ছিল কি না জানি না। অন্তত আমি তো বড় ছেলে হিসেবে ষোল-সতেরো বছরে সন্ধান পাইনি। হত্যাকাণ্ডটিকে তাদের মত বৈধতা দিতে ব্যবহার করা হল মাও-এর ছবি, মতবাদকে। একটি হত্যাকাণ্ড পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে আমাকে অন্য এক বাস্তবতায় এনে দাঁড় করাল, যার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। পরিবারে ভাই-বোনের সিরিয়ালটাও একটা ব্যাপার। বাবার মৃত্যুতে বড় সন্তান যে, তার যেমন করে পরিচিত বাস্তবতা ও জীবন নিয়ে পরিকল্পনা পাল্টে জীবিকা ফোকাস করে জীবন সংগ্রাম শুরু করতে হয়, বাকিদের তেমনটি হয় না। অন্যদের শোক, সন্তাপ, সংক্ষোভ থাকে ঠিকই কিন্তু যাপিত জীবন পুরোপুরি বদলাতে হয় না। আমার পড়াশোনা ছাড়তে হল, ছাড়তে হল মাও সেতুংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে সহজে হৃদয়গ্রাহীভাবে তুলে ধরার অভিলাষ, জার্নালে মাও প্রভাবিত হয়ে লেখা প্রকাশ। এভাবেই অপপ্রয়োগে মাওবাদ, বামপন্থী চেতনা কি অবলুপ্ত হয়ে যাবে, সময় পেলেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম। পিতৃ-হন্তারকেরা মাও সেতুঙের ছবি ব্যবহার করায় হাতের কাছে পেয়েও মাও-এর তাম্রবর্ণের মোহময় মূর্তিটি সঙ্গে আনতে পারিনি একদিন। সে কথা মনে হয়ে এ আশঙ্কা আরও বাড়ে। একদিন কত তরুণ-যুবক বুক পকেটে লাল বই রাখার স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনের মোহমায়া ত্যাগ করে চরম অনিশ্চিত ঝুঁকিবহুল জীবন বেছে নিয়েছে! সেই অমূল্য আবেগ, অকৃত্রিম ভালবাসায় মোড়ানো চেতনা কি সমূলে মুছে যেতে পারে কোনওদিন?

করোনাকালে 'গৃহে থাকো' প্রোগ্রামের সুবিধায় সিনেমাটিনেমা দেখার সুযোগ পেয়ে, প্রাযুক্তিক কল্যাণে ইদানীংকালের হালচালে নির্মিত নতুন অনেক সিনেমা দেখে ফেলি। এই সিরিজ সিনেমা দেখায় হঠাৎই চোখ আটকে গেল এক অভিনেত্রীর বাহুতে অঙ্কিত লাল তারকায়। সিনেমায় মার্কসবাদী মাও-এর অনুসারীদের দেখায় আজও; কারণ, বাস্তবকে ঠিকঠিক তুলে না আনলে দর্শকনন্দিত সিনেমাই হয় না। যারা মার্কসবাদ বা মাও সেতুঙের ধার ধারেন না খুব একটা, তাদের বোঝার সুবিধা করে দিতে বলি– হ্যানিক্যান বিয়ারের লোগোর লাল স্টারটা। যা সিনেমাটিক সৌন্দর্যে বাস্তবের চে' অনেক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিরাজমান ঠিকই, কিন্তু এতটুকু তো বুঝলাম বাস্তবেও মাওবাদ টিকে আছে। যে-কোনও মানবিক মানুষেরই মাঝে, অবিনশ্বরভাবে। তারই প্রতিফলন সেলুলয়েডে বা সিনেমায়। সিনেমা তো যাপিত জীবনেরই রূপোলি প্রতিবিম্ব!

আসিফ কবীর সাংবাদিক, ছোটগল্পকার

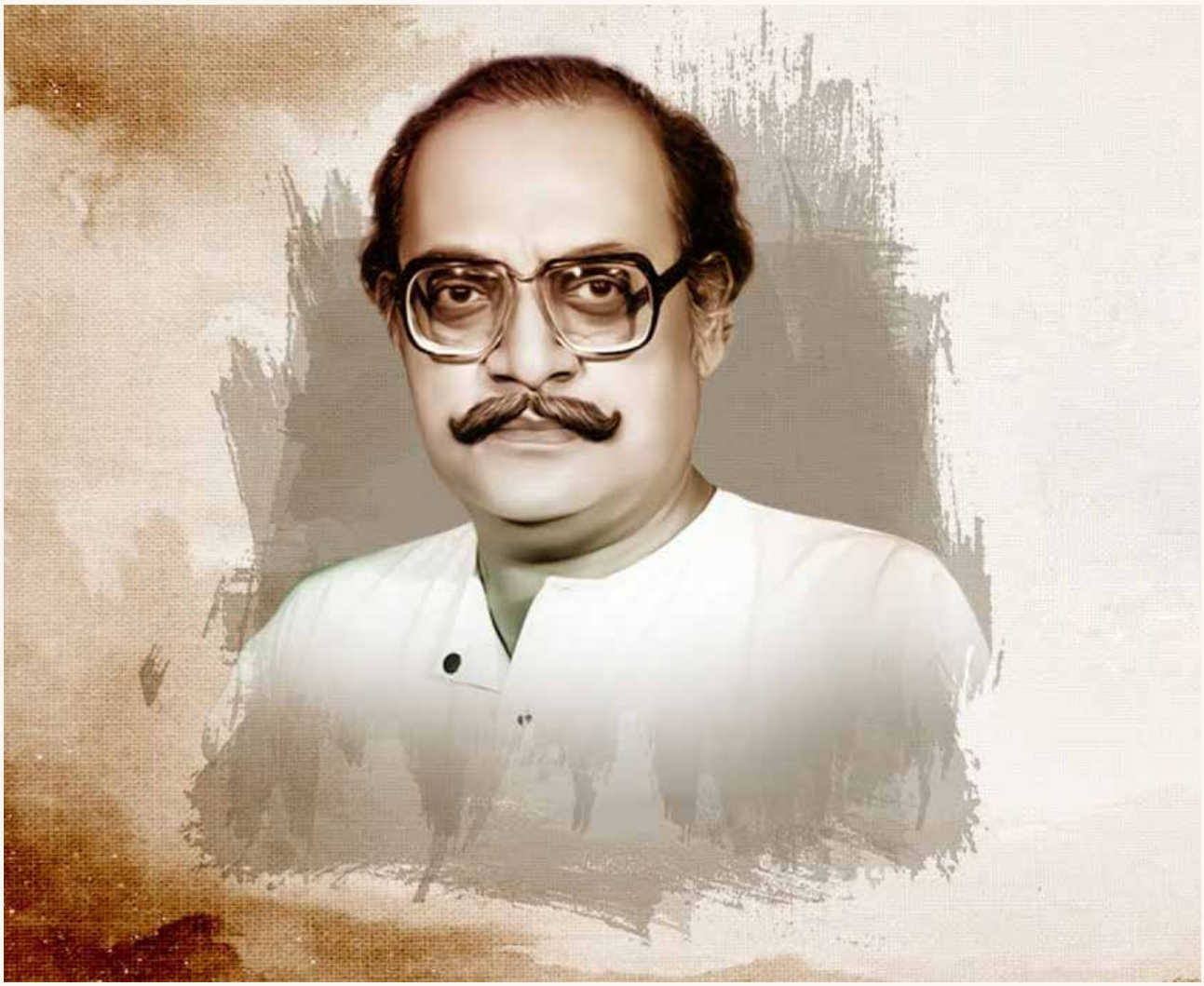

নিবন্ধ

উৎপল দত্ত

লাল দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী

শিশির-উত্তর বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিস্ময় ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ভিলেন ও কৌতুকাভিনেতা উৎপল দত্ত। বাংলা তথা ভারতের নাট্যসমাজের এক আশ্চর্য, তুলনাহীন ব্যক্তিত্বের নাম উৎপল দত্ত। তিনি যে কেবল নট, নাট্যকার, নির্দেশক, গবেষক, চিন্তাবিদ বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রচারক ছিলেন, তা নয়– তাঁর সবকিছুকে নিয়ে ভারতীয় নাট্যজগতে যে বিপুল আলোড়ন উঠেছিল, তাঁর সময়কালে আর কোনও নাট্যব্যক্তিত্বকে ঘিরে তেমনটা হয়নি। তাঁর মত আগে কেউ ছিলেন না, পরেও কেউ আসেননি। পুলিশি নির্যাতন, কারাবাস, দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর নাটকের উপর আক্রমণ... কোনও কিছুই থামাতে পারেনি সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত এই নাট্যব্যক্তিত্বকে।

ছেলেবেলা

পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ, বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তনখোলায়। যদিও তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কুমিল্লা জেলায়। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর জন্মস্থান শিলংয়ে তাঁর মামার বাড়িতে বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তাই সঠিক বলা দুষ্কর আসল জন্মস্থানটি কোথায়। উৎপলের বাবা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মা শৈলবালা রায়ের (দত্ত) পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পারিবারিক ধর্মগুরু তাঁর ডাকনাম রেখেছিলেন শঙ্কর। বাবা গিরিজারঞ্জন ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। তিনি পরবর্তী কালে জেলার হিসেবে ইংরেজ কারাগারের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক (কমান্ড্যান্ট) নিযুক্ত হন।

উৎপলের স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল শিলং শহরের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে। পরে গিরিজাশঙ্কর বদলি হয়ে আসেন বহরমপুর শহরে। এখানেই উৎপলের ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছিল। ছোটভাই নীলিন ও তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বিপ্লবীদের ভয়ে স্কুলে যাতায়াতের সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেহরক্ষী থাকত। জেলের পাঠান রেজিমেন্টের জওয়ানদের সঙ্গে উৎপল ড্রিল করতেন। এই সঙ্গই তাঁকে সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছিল। জেল-সংলগ্ন কোয়ার্টারে সপরিবার তাঁরা থাকতেন। বাড়ির সদর দরজায় মা শৈলবালার হাতে তৈরি এমব্রময়ডারি করা শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পেমেনিয়াসের সংলাপ ঝুলত, 'নেভার কোয়ারেল, নেভার লেন্ড অর বরো ইফ ইউ আর অনেস্ট।' বোঝাই যায়, বাড়িতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশে শেক্সপিয়রের উপস্থিতি ছিল অগ্রগণ্য। মেজদা মিহিররঞ্জন কিশোর উৎপলকে শেক্সপিয়রের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতেন। বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চল ছিল। উৎপল সে সব নাটক মন দিয়ে শুনতেন। তাই তিনি মাত্র ছ'বছর বয়সেই শেক্সপিয়রের নাটকের সংলাপ মুখস্থ বলতে পারতেন। বড়দিদির মাধ্যমে হিন্দুস্তানী মার্গ সংগীতের সঙ্গে পরিচয় বহরমপুরের বাড়িতেই। আরও পরে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের সংস্পর্শে আসেন। তখনও নাটক তাঁকে টানেনি। তিনি চেয়েছিলেন কনসার্ট পিয়ানিস্ট হতে। কিন্তু শিক্ষিকা মিসেস গ্রিনহল তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর হাতের আঙুলের দৈর্ঘ্য বা 'রিচ' কম হওয়ায় তাঁর পক্ষে কনসার্ট পিয়ানিস্ট হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৩৯ সালে গিরিজাশঙ্কর কলকাতায় বদলি হলে দত্ত পরিবার দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত রয় স্ট্রিটে থাকতে শুরু করেন। কলকাতায় আসার পরেই উৎপল বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। তিনি মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের প্রযোজনার রীতিমত ভক্ত ছিলেন। আর অবশ্যই শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের শ্রীরঙ্গমের অভিনয়গুলো। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে তাঁর অভিনয় লক্ষ করতেন। সেইসব মহৎ কারবার দেখে মনে হল, তাঁর পক্ষে অভিনেতা ছাড়া আর কিছুই হবার নেই। বয়স তখন তেরো।

বিশ্বজুড়ে তখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সেই আবহাওয়ায় দশ বছর বয়সের উৎপল ভর্তি হলেন সেন্ট লরেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে। তাঁকে দেখে সহপাঠী, পরে অধ্যাপক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল, 'গ্যালিভার'-এর পাতা থেকে যেন এক অতিমানব এসে হানা দিয়েছিল তাঁদের স্কুলে। স্কুলে বিদেশি নাটক হত। উৎপল অভিনয় করতেন। এর পরে তিনি চলে আসেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, নবম শ্রেণিতে। এই স্কুল ও কলেজ জীবন উৎপল দত্তকে তৈরি করে দিয়েছিল। ১৯৪৫-এ তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলেজে তাঁর কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ছিল গ্রন্থাগারটি। বিভিন্ন বিষয়ের বই তাঁর সামনে মেলে ধরেছিল জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার। বন্ধু পুরুষোত্তম লালের ভাষায়, 'উৎপল হল বর্ন ব্রিলিয়ান্ট। ওই বয়সেই সে শেক্সপিয়রের জগৎকে যেমন আবিষ্কার করেছিল, তেমনই মার্ক্স, লেনিন, স্তালিন, হেগেল, কান্টও তাঁর আয়ত্তে ছিল।'

কলেজে ইউরোপীয় নাট্যচর্চার একটা ধারা আগে থেকেই সজীব ছিল। এখানে পড়াকালীনই একদিকে যেমন ইবসেন বা শেক্সপিয়রের নাটকের জগৎ তাঁর আরও কাছে এসেছিল, তেমনই সেই নাটকে অভিনয় করার নেশা। কলেজ পত্রিকার জন্য তিনি 'বেটি বেলশাজার' নামে প্রথম ইংরেজি নাটকটি লিখেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়েও লিখতে শুরু করেন। সেখানে যেমন ছিল শেক্সপিয়র, বার্ট্রান্ড রাসেল, রুশ সাহিত্য, তেমনই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র... আবার বেঠোভেন, বাখ, শুবার্ট ও বাগনারের মত সুরস্রষ্টারাও বাদ যাননি। পরবর্তীকালে তাই থিয়েটারে সংলাপের পরে সংগীতের প্রয়োগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

১৯৪৭ সালে নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মন্ড কাট্স ডায়মন্ড'-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কলেজজীবনে উৎপলের নাট্য অভিনয়ের শুরু। তাঁর

সহপাঠী অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বন্ধুদের নিয়েই তিনি তৈরি করেন তাঁর প্রথম নাট্যদল 'দি অ্যামেচার শেক্সপিরিয়নস'। তখন তাঁর বয়স আঠেরো। যদিও ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে 'নবনাট্য আন্দোলন'-এর জন্ম দেওয়া 'নবান্ন' নাটকটি তিনি দেখেছেন ও চমকে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের বৃত্তেই তখন তৈরি হচ্ছিলেন সেই নবনাট্যর এক স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করার জন্য। কারণ, দিন বদলের দামামা উৎপল ততদিনে শুনে ফেলেছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের সময়কালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চারের দশক জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুদের ঢল, গণনাট্য, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদিতে সারা দেশ উত্তাল। সেই রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ উৎপলকে বাধ্য করেছিল তত্ত্বগতভাবে আয়ত্তে থাকা মার্ক্সের দর্শনকে নাট্যমঞ্চে প্রয়োগের স্তরে নিয়ে আসতে। ১৫ জুলাই '৪৯ জেভিয়ার্সের মঞ্চে তিনি শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' উপস্থাপন করলেন চরিত্রদের ইতালীয় ফ্যাসিস্ট শাসকের পোশাক পরিয়ে। সমকালীন মাত্রা পেল শেক্সপিয়রের নাটক।

জিয়োফ্রে কেন্ডাল ও শেক্সপিয়রানা নাট্যদল সেন্ট জেভিয়ার্সে থাকাকালীনই শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড'-এ উৎপলের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের দলে টেনে নেন জিয়োফ্রে কেন্ডাল। 'দ্য শেক্সপিয়রানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'তে অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন উৎপল। প্রথম পর্বে কলকাতা ও দ্বিতীয় পর্বে সারা দেশ ঘুরে তিনি এই দলের পেশাদার অভিনেতা হিসেবে শেক্সপিয়রের মোট আটটি নাটকে অভিনয় করেন। জিয়োফ্রেকে শিক্ষাগুরু মনে করতেন উৎপল। শেক্সপিয়রের নাটকে ঠিক কীভাবে অভিনয় করতে হয়, নাটকের দল বলতেই বা কী বোঝায়, তা তাঁকে হাতেকলমে শিখিয়েছিলেন জিয়োফ্রে। শোভা সেনের লেখা থেকে জানা যায়, এই নাট্যদলে কাজ করার সময়ে জেনিফার কেন্ডালের প্রেমে পড়েছিলেন উৎপল। কিন্তু সে সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। জেনিফারকে একজন ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী বলে মনে করতেন উৎপল। তাই পরবর্তী জীবনে শশী কপূরের সঙ্গে জেনিফারের বিয়ে ও অভিনয় ছেড়ে দেওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি।

গণনাট্য সংঘ

শেক্সপিয়রানা দলের হয়ে অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' নাট্যদলের হয়েও অভিনয় করে যাচ্ছিলেন উৎপল। ১৯৪৯ সালে এই দলের নাম বদলে হয় 'কিউব'। ১৯৫০-এ ইউরোপ ও আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আবারও দলের নাম বদলে করেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। ১৯৫২ সালে এই দলে যোগ দেন রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অভিনেতারা। এর পরই বাংলা নাটকের দল হিসেবে 'এল টি জি' পাকাপাকিভাবে আত্মপ্রকাশ করে হেনরিক ইবসেনের বাংলা অনুবাদ 'গোস্টস্' নাটকটি দিয়ে। এক সময়ে উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্পর্ক মাত্র আট (মতান্তরে দশ) মাস স্থায়ী হয়েছিল। গণনাট্যের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আরও অনেকের মত বিরক্ত হয়ে তিনিও বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গণনাট্যই তাঁকে শিল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রথম পাঠ শিখিয়েছিল। উচ্চবিত্ত পারিবারিক পটভূমি, ইঙ্গবঙ্গীয় থিয়েটারের অভিজ্ঞতা, কেতাদুরস্ত ইংরেজি, ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যে ভরপুর আপাদমস্তক 'সাহেব' নাট্য পরিচালক ও নট উৎপল তাঁর যাবতীয় প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সর্বহারা মানুষের মাঝখানে। সেখান থেকে জীবনে আর কখনও বিচ্যুত হননি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে থেকেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন লাল দুর্গের এক অতন্দ্র প্রহরী। গণনাট্য সংঘের হয়ে তিনি পানু পালের 'ভাঙা বন্দর', ইবসেনের 'পুতুলের সংসার', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', গোগোলের 'রেভিজর' অবলম্বনে 'অফিসার', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'চার্জশীট', পানু পালের 'ভোটের ভেট', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' ও শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

এল টি জি প্রতিষ্ঠা ও পথনাটক

উৎপল দত্ত হলেন বাংলা পথনাটকের পথিকৃৎ। তাঁর মতে, 'পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।' সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণির হাত ধরেই এর উঠে আসা। ১৯৫১ সালে উমানাথ ভট্টাচার্যের এক রাতের মধ্যে লেখা 'চার্জশীট' ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম পথনাটক। যা অভিনীত হয়েছিল হাজরা পার্কে। যেখানে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আহমেদ ও পানু পাল। ১৯৫২ সালে 'পাসপোর্ট' থেকে ১৯৯২ সালে 'সত্তরের দশক' পর্যন্ত দীর্ঘ একচল্লিশ বছরে উৎপল দত্ত মোট ২৫টি পথ নাটক করেছিলেন কখনও কোনও কারখানার গেটে, নির্বাচনী জনসভায় বা বন্দিমুক্তি আন্দোলনে উত্তাল বাংলার বিভিন্ন মাঠে ময়দানে। এই প্রযোজনাগুলো হয়েছিল গণনাট্য ও 'উৎপল দত্ত সম্প্রদায়'-এর নামে। পথনাটকে অভিনয়ের সুযোগ তাঁকে করে দিয়েছিল গণনাট্য সংঘ।

মিনার্ভা, উত্তাল সময়

এই সময়কাল উৎপল দত্তর জীবনে গোত্র বদলের কাল। মানুষের মুখরিত সখ্যে নেমে আসছেন তিনি। আর সেই উদ্দেশ্যেই পেশাদার নাট্যমঞ্চ গড়ে নিয়মিত থিয়েটার করে যাওয়ার বাসনায় মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়ে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার থিয়েটার করতে শুরু করেছিলেন। প্রথম দিকে আগে অভিনীত 'ওথেলো', 'ছায়ানট' ও 'নীচের মহল' দিয়ে শুরু হলেও পেশাদার নাট্যমঞ্চের দর্শক তেমনভাবে সাড়া দেয়নি। কিন্তু তারই মধ্যে ঘটেছিল এক আশ্চর্য যোগাযোগ। 'নীচের মহল' নাটকের অভিনয় হচ্ছে মিনার্ভায়। দর্শক সংখ্যা খুবই নগণ্য। নাটকের শেষে মুগ্ধ রবিশঙ্কর দর্শকাসন থেকে উঠে এসে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের পরের নাটকে সংগীত দিতে চাই, নেবেন?' এ প্রস্তাব যেন মরা গাঙে জোয়ার এনেছিল।

এই সময়ে উৎপল দত্তর ব্যক্তিগত জীবনও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল। আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত। মিনার্ভা হলের তিনতলার ঘরটাই ছিল তাঁর বাসস্থান। ততদিনে পেশাদার অভিনেতা হওয়ার তাগিদে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চাকরিটিও ছেড়েছেন। অন্যদিকে সহ-অভিনেতা শোভা সেনের সঙ্গে তাঁর স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। যার প্রভাব পড়ছিল উৎপল দত্তর জীবনেও। পরবর্তীকালে উৎপল ও শোভা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৬১-তে জন্মায় তাঁদের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

হার না মানার পণ নিয়ে

এল টি জির সদস্যরা মিনার্ভা ও অন্যান্য মঞ্চে নাটক করে যাচ্ছিলেন। এমনই এক সময়ে ধানবাদ অঞ্চলের জামাডোবায় চিনাকুড়ি ও বড়াধেমো কয়লাখনিতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। খাদে আগুন ধরে যায়। মালিক আটকে পড়া শ্রমিকদের কথা না ভেবে জল ঢুকিয়ে খনি বাঁচাতে চেষ্টা করেন। শ্রমিকরা মারা যান। এই দুর্ঘটনার খবর রবি ঘোষ তাঁর এক আত্মীয় মারফত নিয়ে আসেন উৎপলের কাছে। খবর পেয়েই তিনি ছুটে যান সেই কয়লাখনিতে। সঙ্গে তাপস সেন, নির্মল গুহরায়, উমানাথ ভটাচার্য, রবি চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। হাজার ফুট নীচের সেই খনিগহ্বরে তাঁরা দু'ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়ান। জীবিত খনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। খনির ভিতরের বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করেন। তার পরে সেখান থেকে ফিরে মিনার্ভার তিনতলার ঘরে বসে টানা ১৫ দিনে লিখে ফেলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। ১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই নাটক প্রযোজনার কাহিনি আজ বাংলা নাট্যজগতে মিথে পরিণত হয়েছে। এর পরে এল টি জি নাট্যদলকে আর পিছনে ফিরতে হয়নি। উৎপল দত্ত তার পর থেকে 'গ্যালিভার'-এর মতই বিচরণ করেছেন বাংলার নাট্যজগতে।

এইভাবেই ক্রমশ মিনার্ভায় 'ফেরারি ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন', 'প্রোফেসর মামলক' ইত্যাদি নাটক পার হয়ে ১৯৬৫ সালের ২৮ মার্চ মঞ্চস্থ হয়েছিল আর এক সাড়া জাগানো নাটক 'কল্লোল'। ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই নাটক বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের সূচনা করেছিল, তা আজও নজিরবিহীন। উৎপল দত্তের বয়স তখন ৩৬।

কারাবাস

স্বাভাবিক কারণেই 'কল্লোল'-এর বিরুদ্ধে সরকারি ক্রোধ নেমে এসেছিল।

পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে নাটকটি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বলা হয়েছিল, মিনার্ভা থিয়েটার 'কমিউনিস্টদের বেলেল্লাপনার আখড়া'য় পরিণত হয়েছে। এই নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপা নিষিদ্ধ করেছিল তৎকালীন কলকাতার প্রায় সব খবরের কাগজ। কিন্তু তাপস সেনের করা 'কল্লোল চলছে চলবে' পোস্টার ও মন্মথ রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের পাঠানো প্রতিবাদপত্রে নাটকের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ভারত রক্ষা আইনে উৎপল দত্তকে গ্রেফতার করে জেলবন্দি করা হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সরব হয়েছিলেন শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা। কলকাতার রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পর ৭ মে ১৯৬৬ ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল 'কল্লোল বিজয় উৎসব'।

নকশাল আন্দোলন, 'তীর' নাটক, মুচলেকা

নকশাল আন্দোলন উৎপল দত্তকে আগ্রহী করেছিল। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বামপন্থী মহল প্রশ্ন তুলেছিল। তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে বর্জন করেছিলেন। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হিসেবে উৎপল আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আজীবন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও দায়বদ্ধ শিল্পী নকশাল রাজনীতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের 'তীর' নাটক যার ফলশ্রুতি। তিনি আবারও সরকারি নজরদারির আওতায় চলে আসেন। তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুম্বই শহর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একটি 'আর্মস ডিল'-এর সূত্রে তিনি নাকি মুম্বই গিয়েছিলেন। তখন ইসমাইল মার্চেন্টের 'গুরু' ছবিরও কাজ চলছিল। সেই শুটিংয়ের আড়ালে পার্টির জন্য ওই আর্মস ডিলের কাজ করছিলেন তিনি। তাজ হোটেল থেকেই স্বেচ্ছায় ধরা দেন উৎপল। কিন্তু বন্দি হয়ে জেলে বসে থাকলে তাঁর পক্ষে শুটিং চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। অনেক টাকার ক্ষতিপূরণও দিতে হত। সেই অবস্থা এড়াতে ইসমাইল মার্চেন্ট সরকারি উচ্চমহলে যোগাযোগ করে অভিনেতার জামিনের ব্যবস্থা করেন। জামিন পাওয়ার শর্ত হিসেবে তাঁকে মুচলেকা দিতে হয় যে, তিনি আর কখনও কোনওরকম রাজনৈতিক নাটক লিখবেন না ও করবেন না। অবশ্য তাও তিনি বাকি জীবনে রাজনৈতিক নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করা থেকে বিরত হননি।

পি এল টি

নকশাল রাজনীতি থেকে পরে নিজেকে সরিয়ে নিলেও উৎপল দত্ত জীবনের ওই পর্বে ছিলেন রাজনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ। নিজের দল এল টি জি তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। সেই নিঃসঙ্গতা ও সংকট মুহূর্তে তিনি মঞ্চস্থ করেন 'মানুষের অধিকার' নামে আরও একটি কালজয়ী নাটক। যদিও এই নাটক নকশালপন্থীদের সমালোচনার মুখে পড়েছিল। অতি-বামদের বৈরিতা শুরু হয়। তার প্রভাব এসে পড়ে এল টি জি দলের মধ্যে। সাত সদস্য দলত্যাগ করেন। উপদলের জন্ম হয়। ফলে ১১ বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া একটি অন্যধারার পেশাদার থিয়েটারের ইতি ঘটিয়ে উৎপল দত্ত মিনার্ভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গড়ে তোলেন 'বিবেক নাট্যসমাজ', যা পরবর্তীকালে নতুন দল 'পিপলস লিটল থিয়েটার' বা 'পি এল টি' নামে পরিচিতি পায়। ১৯৭১ সালের ১২ অক্টোবর রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হয় দলের প্রথম নাটক 'টিনের তলোয়ার'। এই নাটকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসটি সুন্দরভাবে ধরা পড়লেও 'অশ্লীল' ঘোষিত হওয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর পরে 'সূর্যশিকার', 'ব্যারিকেড', 'টোটা', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'তিতুমীর', 'স্তালিন ১৯৩৪', 'লালদুর্গ', 'জনতার আফিম' পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন 'একলা চলো রে' নাটকে। যে নাটকে তিনি শেষবারের মত মঞ্চে নামেন।

রাজনৈতিক যাত্রাপালা

রবি ঘোষের মতে, উৎপল দত্তর জীবনজুড়ে আছে আরও এক বিশেষ অধ্যায়, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাপালা। ব্রেখট ভক্ত উৎপলের কাছে যাত্রা ছিল মানুষের মাঝে পৌঁছনোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। শহুরে প্রোসেনিয়াম ছেড়ে তিনি যেমন রাস্তায় নেমে এসে নাটক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তেমনই যাত্রার মঞ্চকে ব্যবহার করে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় পা রেখেছিলেন। নিউ আর্য অপেরার হয়ে 'রাইফেল' পালার মধ্য দিয়ে তিনি পেশাদার পালাকার ও পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৮ অবধি সফল পালাকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত ছিলেন চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার একচ্ছত্র অধিপতি।

চলচ্চিত্র

'নাটক ও যাত্রা আমাকে সৃষ্টির আনন্দ দিলেও চলচ্চিত্র দিয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ, মানে টাকা। হিন্দি চলচ্চিত্র আমাকে সর্বভারতীয় অভিনেতা হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিল।' মধু বসুর 'মাইকেল' ছবিতে মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্তর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা। অসংখ্য বাংলা ও হিন্দি বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করলেও তাঁর নিজের ভাললাগার ছবিগুলো তৈরি হয়েছিল অজয় কর, তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শক্তি সামন্তর মত পরিচালকের ছবি দিয়ে। তিনি যে কত বড় কৌতুকাভিনেতা, তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে এঁদের ছবিতে। আবার মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, গৌতম ঘোষের ছবিতে তাঁর অভিনয় একেবারে অন্য গোত্রের। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' তাঁকে চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তবে যাঁর ছবিকে তিনি বারবার কুর্নিশ করেছেন প্রথম থেকেই, তিনি সত্যজিৎ রায়। 'পথের পাঁচালি' বা 'জন অরণ্য' দেখে সত্যজিৎকে লেখা তাঁর আবেগরুদ্ধ চিঠি রয়েছে। সত্যজিৎকে তিনি ডাকতেন 'স্যর' বলে। সত্যজিৎও মুগ্ধ ছিলেন উৎপলের প্রতিভায়। বলেছিলেন, 'উৎপল যদি রাজি না হত, তবে হয়তো আমি 'আগন্তুক' বানাতামই না।' 'আগন্তুক' ছবিতে উৎপলকে নিজের প্রতিভূ হিসেবেই ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ।

জীবনসন্ধ্যা, প্রয়াণ

নট, নাট্যকারের স্তর থেকে উৎপল দত্ত ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বের সেরা শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ও একজন প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাবিদের পর্যায়ে। বাংলা নাটকে যেমন মাইকেলকে নতুনভাবে এনেছিলেন গিরীশ ঘোষ, তেমনই বার্টোল্ড ব্রেখটকে যুক্ত করেছিলেন উৎপল দত্ত। নিজেই বলেছেন, তাঁর উপরে প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার নিকোলে পাভলোভিচ অখলোপকভ-এর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সিনেমা নয়, তাঁর আসল জাত চিনিয়েছে নাটক। 'নির্দেশক উৎপল দত্তর কর্মকাণ্ড শিশির-উত্তর বাংলা রঙ্গমঞ্চকে যতখানি সমৃদ্ধ করেছে, ইতিহাসই সেই অতুলনীয় সম্পদের কোষাগার হয়ে থাকবে।' উৎপল দত্তের সঙ্গে নাটকে কাজ করতে চেয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সৌমিত্র। আন্তন শেফারের 'স্লিউথ' নাটকটি তাঁকে অনুবাদ করতে দেন উৎপল। কথা ছিল, ওই নাটকে দু'জনে অভিনয় করবেন। কিন্তু তা আর হয়নি। পরে সেই নাটক 'টিকটিকি' নামে সৌমিত্র করেছিলেন কৌশিক সেনের সঙ্গে। উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে নাটক, চলচ্চিত্র ও যাত্রার অনেক অভিনেতা ও পরিচালকের মনে। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হত, 'মহলার সময় বাবা যেন এক যুদ্ধের সেনানায়ক।' অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ তাঁকে গুরু মানতেন। রবি ঘোষ বলতেন, 'উৎপল দত্ত ছিলেন সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ 'স্টেজ স্টলওয়ার্ট'। স্টেজ প্রোডাকশনের এ টু জেড জানতেন। আমার অভিনয়ের বেসিক ট্রেনিং তো ওঁর কাছেই পাওয়া।'

তরুণ মজুমদারের মনে আছে, 'ওঁর 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবির রায় সাহেবের চরিত্রটা এত পছন্দ হয়েছিল যে, এগ্রিমেন্ট পেপারে সই করে পারিশ্রমিকের জায়গাটা ফাঁকা রেখে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ফ্লোরে মেকআপ নিয়ে পাঁচ মিনিট আগেই উপস্থিত হতেন। হাতে থাকত মোটা মোটা বই। শটের ফাঁকে পড়তেন। ডাক পড়লেই উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'ইয়েস স্যর।'

মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঠাট্টা করে তিনি বলেছিলেন, 'ষাট বছর বয়স হলে বিপ্লবী আর বিপ্লবী থাকে না। প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়।' ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট ৬৪ বছর বয়সে উৎপল দত্তের জীবনাবসান হয়।

ঋণস্বীকার
অরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার দাস

ধারাবাহিক উপন্যাস

রেড পার্সেন্টেজ

তাপস রায়

রেড পার্সেন্টেজ

রেড পার্সেন্টেজ একটি রহস্য উপন্যাস। কোভিডকালে অসংখ্য মানুষের চাকরি চলে যায়। এই সব বেকার ছেলেরা হাতের সামনে যা পায়, তাই নিয়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে তখন। এদের ভেতর একটা বড় অংশ যুক্ত হয় ক্যুরিয়ের সার্ভিসে। পিঠে একটা লজিস্টিক ব্যাগ চাপিয়ে সাইকেল বা বাইকে চেপে এরা খাবার বা যে কোনো অনলাইন প্রোডাক্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গজনী এরকম সার্ভিস নিয়ে নিজের অজ্ঞাতে বিপদে জড়িয়ে পড়ে। সে না জেনেই ব্যাগের ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা একটা শিশুকে পৌঁছে দিয়ে আসে ধান্যকুড়িয়ার এক বাড়িতে। জানাজানি হয়। শুরু হয় থানা পুলিশ। এই রহস্যের ভেতর ঢুকে পড়ে ধান্যকুড়িয়ার ইতিহাসের অধ্যাপিকা উজ্জয়িনী। ধান্যকুড়িয়ায় পুরনো জমিদার বাড়ি প্রচুর। ইতিহাসের খুঁটিনাটি দেখার চোখ দিয়ে সে শুধু চোরাচালান রহস্যেরই উন্মোচন করে না। পৌঁছে যায় পুরনো মোহরের সন্ধানে। বর্তমান আর ইতিহাস হাত ধরাধরি করে উপস্থিত এই রহস্য উপন্যাসে।

এই ল্যাপটপের ব্যাগটা পিঠে ওঠা মানে কেজো মানুষ সে। বেলা দুটো হোক তিনটে হোক জুতো-মোজা পরে ব্যাগ পিঠে নিয়ে বের না হলে তার চলবে না। এই ব্যাগটা পিঠে ফেলতে পারলেই তার হাত-পা-মন পুরনো দিনের মত ছুটতে থাকে। তখন সে আর রিটায়ার্ড পার্সন নয়। এতে রোজ বেশ খানিকটা টাকা যে ব্যয় হয়, তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই গজনীর।

কমপ্লেক্সের কেয়ারটেকার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পাল্টায়। রাত আটটার কেয়ারটেকার গেট খুলে নিজের হাউজিং-এ স্বাগত জানায়। বেশ লাগে। নিজেকে অপদার্থ লাগে না। তবুও মাঝে মাঝে গিন্নি অপদার্থ বলে দেগে দেয়। বছর ঘুরতে চলল, রোজ বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, কিন্তু এখনও একটা কাজ জুটোতে পারল না।

কাজ জুটবে কী করে! লোককে বললে তো! বন্ধুবান্ধবকে বলতেই পারেনি, সে রিটায়ার করেছে। তার কেবলি ভয়, যদি বন্ধুরা আর তাকে পাত্তা না দেয়। কর্মহীন মানুষকে কে কবে পাত্তা দিয়েছে! অনলাইনে দু-একটা ছোটমোটো জবে অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছে অবশ্য। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

অলি বলল, 'উত্তর ফুরিয়ে ফেলেছ যদি, দক্ষিণ এবার ধরো।'

'ধ্যাৎ! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি বলে আমার পছন্দ-অপছন্দ নেই নাকি! দক্ষিণে আবার মন কেমন করা গলি এল কোত্থেকে, যে ঘুরব! উত্তরে এক একটা রাস্তা দিয়ে শ'খানেক বার ঘুরলেও, গা ছমছমে একটা ভাললাগা থাকে। এই যেমন কোনও বাড়ির জানালা দিয়ে গিরীশচন্দ্র গোল গোল চোখ মেলে চেয়ে আছে, হঠাৎ মনে হবে। কতদিন দেখতে দেখতেও দেখিনি রকে বসে আড্ডা মারছে অমৃতলাল। মনে হয় বিনোদিনী বুঝি সন্ধ্যেবেলায় লাল ফিতেয় চুল বাঁধতে বাঁধতে ছিদাম মুদী লেনের মুখটাতে চলে আসবে। দু'পয়সার কড়া পাকের সন্দেশ খাবে লুকিয়ে। তাকে যদি একবার চোখের দেখা দেখা যায়! আর ওই যে কুমারটুলিতে বনমালী সরকার স্ট্রিটে বনমালী সরকারের প্রাসাদের দিকে হাঁকরে তাকিয়ে থাকার সুখ!'

অলি কথা বাড়ায় না। শ্যামবাজারের মিত্র কাফের হাফ দোতলার কেবিনে বসে ফিস কাটলেটে বড় করে কামড় দেয়। খুব খিদে লেগেছে। দুপুরে এক কাপ চা আর এক ঠোঙা মুড়ি খেয়েছে। তার ধৈর্য নেই কাঁটা চামচ ব্যবহার করার। গজনী ব্যানার্জি হাঁ করে দেখতে থাকে সুন্দরী অলির বিশাল হাঁ।

ভাবে কৃষ্ণের বিশ্ব দর্শন মনে হয় এরকমই। অলির সাদা দাঁতের ভেতরের কালো আর আলজিভও সে দেখতে পেয়েছে।

গজনীর মনের ভেতর কত কত রাস্তা ঢুকে গেছে এই কতক দিনে। মানুষের পৌঁছনোর তাগিদ ছাড়াই আরও কত রাস্তা পড়ে আছে। বিকেলের গা-ধোয়া আলো মেখে তারা সব মায়াবী। কিন্তু এই সব রাস্তার বুকের ভেতর, পেটের ভেতর যে হাহাকার, তা কি দেখা হল গজনীর! বীরেন্দ্রকৃষ্ণর মূর্তির সামনের রাস্তায় কি অলিদের মত অনেক অনেক ক্ষুধার্তরা থাকে! এই মেয়েটিই যদি বেনেটোলা লেনে গৌরাঙ্গ বাইন্ডার খানায় বই বাঁধানোর কাজ না করে নিউটাউনের আইটি সেক্টরে কাজ করত, তবে কি এমন করে ফিশ কাটলেট খেত! কাটা চামচ ব্যবহার করত না! খেতে খেতে উল্টোদিকের পুরুষ মানুষটার চোখের দিকে খানিক চেয়ে থাকত না!

অলির প্লেট খুব তাড়াতাড়ি শূন্য হতে চলেছে। পেঁয়াজ আর শশা কুচিতে হাত পড়েছে তার। প্লেট ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে অলির পেটের ক্ষিদে। এরপর চা আসবে। চা খেয়েই উঠে পড়বে অলি।

তাকে আটটার ভেতর বাড়ি পৌঁছতে হবে। রাত নটায় যে তার অটোচালক স্বামী বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আটটা থেকে ন'টা ওই এক ঘণ্টার ভেতর স্বামীর জন্য বারোখান রুটি, তার আর পুচকে ক্লাস থ্রির ছেলের জন্য চারটি চারটি করে আটটা, মোট কুড়িটা রুটি বানাতে হবে। সঙ্গে আলু-কুচির তরকারি। কোনওদিন সাথে একটু পেঁয়াজের টুকরো। চা খাচ্ছে না সরবত খাচ্ছে! গজনী নিজের কাপে তো ঠোঁট ছোঁয়াতে পারেনি। একবার মুখে তুলতেই ছ্যাঁকা লেগেছে। ঝপ করে নামিয়ে রেখেছে টেবিলে। চোখে কাজলের রেখা নেই। কপালে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটু সিঁদুরের বিন্দু। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। কানে দশটাকা জোড়া চকচকে কানের দুল। সাদা কামিজ আর কালো শালোয়ার-এ যতটুকু ভব্য থাকা যায়। একদম কম দামের ওড়না।

নিতে হয় তাই নেয়া। তা দিয়ে ঠেলে ওঠা বুক ঢাকা যাচ্ছে কিনা সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই অলির। দপ্তরিখানায়, রাস্তাঘাটে, অটোতে দিনে কত-কতবার যে কতজন ওর বুক চাটে! গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর তেমন কিছু মনে হয় না। গজনী দেখছিল পাশের টেবিলের বয়স্ক ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরেই অলির বুকের উপর চোখ বোলাচ্ছে।

'চা খুব গরম। তুমি আস্তে আস্তে খাও। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি গজনীদা।'

গজনীর খুবই খারাপ লাগে। তার চা খাওয়া শেষ করা পর্যন্তও সময় দিতে অপারগ অলি! অথচ অলির জন্য কত কতক্ষণ বাগবাজার ঘাটে বসে থাকে গজনী। অলি আসার সময় হলে সে ঘাট থেকে উঠে শ্যামবাজারের মোড়ে যায়। তারপর এই মিত্র কাফে।

অলির কথার কোনও উত্তর দেয় না গজনী। সে অলির চলে যাবার দিকেও তাকায় না। কিছু একটা তার মুখ চেপে রাখে মাটির দিকে। প্রতিদিনই ভাবে, আর না। এমন অপমান এই বয়সে আর নেয়া যায় না। একটা ইতি টানতে হবে। কিন্তু রাত কেটে গেলেই কী এক অদৃশ্য টানে তার মনে টান ধরে।

তারপর একটু বেলা করে বেরিয়ে পড়া, পিঠে ব্যাগ।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি। গজনীর হাতে আরও ঘণ্টাখানেক সময়। শ্যামবাজার থেকে মেট্রো না ধরে বাগবাজারের মোড়ে এসে ২৪০ ধরে ঘণ্টা দেড়েকে বাসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে নামবে ঢাকুরিয়ায়। সেখান থেকে আটোতে উঠে বাড়ির সামনে নামবে। রাত সাড়ে-আটটা ঠিক টাইম। গজনী মুখ কালো করে মিত্রকাফের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তারপর একা একাই এখন হাঁটবে কিছুটা। আজ বৃন্দাবন পাল লেনে গিয়ে ঢুকল গজনী।

'দাদা, কিছু মনে করবেন না, আপনি গজনী ব্যানার্জি?'

গজনী চমকে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখল একজন বছর ত্রিশের যুবক ঘ্যাঁচ করে লিকলিকে সাইকেলের ব্রেক চেপে দাঁড়াল। প্রায় গায়ের উপর। কালো, লম্বা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পিঠে একটা বড় ব্যাগ।

গজনী রাস্তার বাঁ-দিকে দু-পা পিছিয়ে গেল।

ছেলেটা বলল, 'দাদা, ভয় পাবেন না। আপনি নকড়ি ডট কমে কাজের খোঁজ করছিলেন। আপনার ব্যাগে কী আছে?'

গজনী কিছু না ভেবেই বলল, 'কিছু নেই। খালি একটা জলের বোতল আর খবরের কাগজ।'

ছেলেটা বলল, 'হবে। দাদা, আমরা নিজেদের ভেতর খানিকটা সময় ব্যাগ বদলা বদলি করব। অল্প একটু সময়ের জন্য। আগের বড় রাস্তা ভূপেন বোস ক্রস করে প্রথম ডান দিকের গলিতে ঢুকলেই আপনার কাছ থেকে একজন নীল জামা পরা বৃদ্ধ ভিখিরি এই ব্যাগ নিয়ে নেবে। আপনি গলি থেকে বেরিয়ে এলেই আর একটি ছেলে সাইকেলে চেপে আপনার ব্যাগ আপনাকে পৌঁছে দেবে। এই পাঁচশো টাকা রাখুন। আর হ্যাঁ দাদা, কাল থেকে আপনি আর ব্যাগ পিঠে করে আনবেন না। আমি এরকম সময়েই আপনাকে একটা ব্যাগ দেব। আর আপনি আবার সেরকম করে ব্যাগ দিয়ে দেবেন। কেমন? আপনার কাজ আজ থেকে শুরু।'

অলি ভেজটেবল কাটলেটে কামড় দিয়ে বলল, 'কী হল, আজ যে ফুল বাবুটি সেজে এসেছ! এমনকি কাঁধে ব্যাগটিও নেই! ঝাড়া হাত-পা! মানে কেমন একটা ইয়ং লুক। দারুণ তো!'

গজনী বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দেরি হয়ে যাবে।'

অলি খাবারে মন দিয়েই আবার চোখ তুলে ফেলল গজনীর মুখের উপর। গজনী তখন হাতের ঘড়িটির উপর চোখ ফেলেছে। আজ সে নিজে কাটলেট নেয়নি। আজ শুধুই চা। অলি বলল, 'ঘড়ি দেখছ কেন? আজ বড় যে ঘড়ির দিকে মন! অন্যদিন তো আমার দিকে মন থাকে। আমাকে ধরে বেঁধে বেশি সময় কাছে রাখতে চাও।'

গজনী মনে মনে হাসে। আজ একটু নিজের কলজেটাকে ঠাণ্ডা করতে পারবে। এতদিনের অপমান ফিরিয়ে দেবে অলিকে। সে মিষ্টি করে হেসে বলল, 'না না। খাও খাও।'

সার্ভিসের ছেলেটা এসে গেছে। গজনী ইশারায় বলে দিয়েছিল বিলের কথা। প্লেটে করে মৌরি আর বিল রাখতেই অলি অবাক হয়। গজনী বিলের টাকার সাথে আরও কুড়ি টাকা বেশি দিয়ে ওকে বিদেয় করে বলে, 'অলি, তুমি আস্তে ধীরে খাও। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। কাল দেখা হবে কেমন।'

অলিকে কিছু বলার সময় না দিয়েই গজনী কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়। উল্টো দিকের ফুটপাথে টাইটানের দোকান ছাড়িয়ে ডানহাতের রাস্তা দিয়ে ঢুকে বৃন্দাবন পাল লেনের মুখে দেখা হয়ে গেল। গজনীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাহলে একদিনের কাজ ছিল না। ছেলেটা যেমন বলেছিল, আজও তেমনি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসেছে। গজনীর ভাল লাগছে শুধু হাতে গরম পাঁচশো টাকার জন্য নয়, এই যে কিছু একটা কাজ এত বয়সে করতে পারছে, মানে আবার রোজগার করতে পারছে, তার জন্য আনন্দ।

আনন্দ আজ ডাবল হয়েছে। কতদিন বাদে ফুরফুর করে সাইকেল চালাল গজনী। দেখল ভোলেনি। সে শুনেছে, সাইকেল চালানো আর সাঁতার একবার শিখলে কেউ ইচ্ছে করেও ভুলতে পারে না। বেশ চালাতে লাগছিল। ছোটবেলার সেই ভারী হিরো সাইকেল নয়। এ বেশ হালকা-পুলকা আর ছোটেও দারুণ। গজনীর ভাল লাগার ভেতর একটু খচখচ করছিল পিঠের বোঝা। আজকের বোঝা বেশ ভারী। আর ছেলেটা বলেছে সাবধানে নিতে, কোথাও যেন ঘাই-গুঁতো না লাগে।

এখানকার সব রাস্তাঘাট চেনে গজনী। সাইকেল চালিয়ে অভয়মিত্র

স্ট্রিট হয়ে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের আগে আসতেই মাটি ফুঁড়ে সামনে হাজির এক ছেলে। সে পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে দিয়ে বলল, 'আজকের মজুরি।'

গজনী তার রিক্রুটার ছেলের কথামত পিঠের ঢাউস ব্যাগ সমর্পণ করে দেয়। মনে হয় একটু ইতস্তত করেছিল গজনী। ছেলেটি সন্দেহ নিরসনের জন্য বলল, 'ভাবছেন, কাল ছিল পাঁচশ টাকা, আজ এক লাফে হাজার! আরে দাদা, দেখুন না, কালে কালে আপনি কোথায় পৌঁছে যান। আজ মজুরীতে এই বৃদ্ধির লাফ তো এমনি এমনি হয়নি। আজ সাইকেল চালিয়ে আপনি মাল নিয়ে এদ্দুর এলেন। তো দাদা, সাইকেল চালাতে আপনার অসুবিধে হয়নি তো?'

গজনী অল্প হেসে বলল, 'না তেমন কিছু একটা হয়নি। প্রথমে ভাবছিলাম পারব কি না! সেই কলেজ জীবনে শেষ সাইকেলে চেপেছি। আবার চালাতে পারব তো!'

'না না, পারবেন না কেন! আলবত পারবেন। শেখা জিনিস কেউ কোনওদিন ভোলে নাকি!'

'এটা ঠিক।' ফেরার সময় সাইকেল চালানোটা বেশ এনজয় করল গজনী। যাবার সময় যে পিঠে ঢাউস ব্যাগ ছিল বলে একটুকুন টলমল হয়েছিল। আর গলির ভেতর হলেও এদিক ওদিক থেকে হুশহুশ করে গাড়ি চলে আসছিল যে!

তৃতীয় দিন সেই প্যাংলা ছেলেটা বলল, 'দাদা, এই কাজটা কি আপনার ভাল লাগছে?'

গজনী কী বলবে! সে তো বর্তে গেছে। গত এক বছর ধরে যে মনোকষ্টে ভুগেছে তা দুদিনে উধাও। যে টাকাই পাক না কেন, নিজের উপর আস্থা আসছে। নিজেকে আর বাতিল লাগছে না। সে মাথা দু'দিকেই নেড়ে বলল, 'ভাল লাগছে। আর আপনি ভাই, আমার থেকে অনেক ছোট হলেও বেশ একটা সম্ভ্রম করার মত মানুষ। কেমন যেন আপনজন আপনজন লাগছে।'

গজনী প্রথম সুযোগেই কর্মদাতার গুডবুকে ঢুকে পড়তে চায়। কাজটা তাকে যা স্বস্তি দিয়েছে, তা আর বলার না। পাশাপাশি অলির অসম্মানেরও একটা যোগ্য জবাব দিতে পারছে এই কাজটার দৌলতে। সে এখন বেশ ফুরফুরে। কাল হাজার টাকা পাবার পর গোলবাড়ির কষা মাংস বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে গেছে।

ছেলে প্রতিম ডিনার টেবিলে খুব চেটেপুটে খেয়ে বলেছে, 'সাধে লোকে গোলবাড়ি গোলবাড়ি করে! মুখে লেগে রইল বাবা। আবার কত বছর পরে খাব কে জানে! ততদিন মনে রাখব আজকেরটা।'

হেনা, মানে গজনীর স্ত্রী বলল, 'তোর ভাল লেগেছে যদি আবার আনা যাবে। দরকারে আমি অনলাইনে আনিয়ে নেব। জোমাটোতে অর্ডার দিলেই পাবি। বাপে একদিন কী একটা এনেছে বলে একেবারে গদগদ! আমি যে কতকিছু আনিয়ে খাওয়াচ্ছি, তার বেলা কোনও স্বীকৃতি নেই। এই তো সেদিন খাস পূর্ণিয়ার মাখানা আমাজনে এনে খাওয়ালাম।'

কাজটা ডেলিভারি ম্যানের। বয়স কোনও বাধা নয়। আর ভিআরএস নেয়া গজনী বেশ শক্ত-পোক্ত। লম্বাটে ছাঁচ। রিটায়ারমেন্টের পর খানিক যে নাদুসনুদুস ভুঁড়ি দেখা যাচ্ছিল, এখন সাইকেল চালাতে চালাতে তা উধাও। গজনী ভালবাসছে জবটিকে।

মাসখানেক শ্যামবাজার, বাগবাজার, আহিরিটোলা, বনহুগলি পর্যন্ত কাজ করার পর গজনী চলে এসেছে বসিরহাটের দিকে। মানে কোম্পানি তাকে এদিকে পাঠিয়েছে। গজনীর খারাপ লাগার কথা নয়।

নতুন জায়গা, নতুন রাস্তা, নতুন পরিবেশে যাওয়া তো তার প্যাশনের ভেতর পড়ে। কোম্পানি একটা সাইকেল দিয়েছে গজনীকে। আর বেড়াচাঁপার দিকে একটা সস্তার ঘরও ভাড়া করে দিয়েছে। গজনীর আরও একটা জিনিস ভাল লাগে এই হাতে গরম পয়সা। প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন সে পেয়ে যায়।

বসিরহাটে এসে গজনী 'বিট' পেয়েছে। মানে তকমা। এখানে সবাই বিট নম্বর-এ পরিচিত। তার বিট নাম্বার ১১১। বেশ ভাল নাম্বার। এখানে এসে দেখল অনেক অচেনা ছেলে এই লাইনে। শ্যামবাজারে থাকতে তো সে ওই প্যাংলা ছেলেকে চিনত। কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করেনি, নাম জানে না। এখানে কাউকেই চেনে না। রোজই নতুন নতুন সাইকেল আরোহীকে পায়। এক পিঠ থেকে অন্য পিঠে চেপে মাল ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যায়। বিটদের মধ্যে প্রত্যেকেই মাসে একদিন বা দু'দিন গন্তব্যে মাল পৌঁছানোর দায়িত্ব পায়। এছাড়া, মাসভর চেন সিস্টেমে মাল চলতে থাকে। শ্যামবাজার অঞ্চলে একদিন গৃহস্থের দরোজায় যেতে পেরেছিল গজনী,এখানে এখনও সে সুযোগ আসেনি। এই অক্টোবর মাসে অনেকখানি জায়গা ঘুরেছে। সেই হাবরা থেকে এদিকে মধ্যমগ্রাম আর অন্যদিকে বসিরহাট, টাকি, ইছামতীর পাড় পর্যন্ত। আগের দিনের লোডে ৯ নম্বর বিটকে পেয়েছিল। ৯ নম্বরকে দু'বার পেল।

তাছাড়া সবাই প্রতিদিন নতুন। কেউই এক জায়গায় দু'দিন কাজ করে না। গজনীর, মানে বিট নম্বর ১১১-র গতদিনের শিফটিংপ্লেস ছিল টাকি, ইছামতীর ঘাট। সেখানে জেলে নৌকো চলছিল। তার একটাতে ঢাউস একটা ব্যাগ উঠিয়ে দেয়া। খুব ভারি ছিল ব্যাগ। গজনীর কাল কষ্ট হয়েছে। বয়স মালুম হচ্ছে তার। তবে দেখেছে ওজন বেশি হলে মজুরি এক লাফে পাঁচশো থেকে হাজারে চলে যায়। আজ ধান্যকুড়িয়ায় এসেছে। গতদিনের তুলনায় বেশ হালকা ছিল লাগেজ। গাইন গার্ডেনের সামনে আজ বেশ ভিড়। গজনী জিজ্ঞাসা করে জানল ভেতরে শুটিং হচ্ছে। হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত নায়িকার একটি গানের দৃশ্য শুট হবে। গজনীর ইচ্ছে সে অন্যদের মত দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু মাল নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে না দিয়ে কোথাও দাঁড়াবার নিয়ম নেই। অগত্যা তাকে চলে যেতে হয় পাশের রাস্তায়।

আর খানিকটা দ্রুত সে সাইকেল চালায়। উদ্দ্যেশ্য মালটা ডেলিভারি দিয়ে এসে দাঁড়াবে এখানে। এটা প্রিপেড ডেলিভারি। গজনী সাইকেলের প্যাডেলে জোরে চাপ লাগায়।

দুই.

'মা, জানো তো আজ এখানে গজব হয়েছে। নীলুজেঠুর বাড়িতে...'।

'দাঁড়া, দাঁড়া। আগে ঘরে ঢুকতে দে। বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে আসি, তারপর চায়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করব।'

প্রায় দু'বছর বাদে কলেজে যেতে পেরে উজ্জয়িনী বেজায় আনন্দে আছে। ফেরার সময় মেয়ে দু'টির জন্য মিষ্টি কিনেছে। মিষ্টির প্যাকেট আহিরার হাতে ধরিয়ে দিয়ে উজ্জয়িনী সোজা ওয়াশরুমে ঢুকে গেল।

চায়ের মগ আর দু'খানা গোলাকার ঝুরিভাজা নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে উজ্জয়িনী বলল, 'জানিস তো আজ ছেলেমেয়েরা এমন করে ম্যাম, ম্যাম করছিল, আমার কানে আসছিল 'মা মা'।

ওরা এমন করে ঘিরে ধরেছিল যে, চুলোয় যাক করোনাবিধি, আমি সক্কলের থুতনি নেড়ে দিয়ে আদর দিয়েছি। ওরা এমন কলকল করছিল, যেন লকগেট খুলে গেছে বাঁধের। আর জলরাশি স্বাধীনতার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। জানিস আহিরা, আমার খুব মনে পড়ছিল তোদের কথা। আমার কানে যে 'মা মা' ডাক!'

আহিরা মা-র গায়ের ভেতর ঢুকে গেছে। এত বড় হয়েছে, তবুও অভ্যাস পাল্টায়নি। কলেজ থেকে ফিরলে ছোটটি মায়ের গায়ের ভেতর ঢুকে মার শরীরের ঘ্রাণ নেবেই নেবে। আর উজ্জয়িনীও ছোটটিকে একবার বুকে জড়িয়ে নেবে বাঁহাতে। চেয়ার টেবিলে বসার ব্যবস্থা নেই। ওদের ড্রইংরুমে মাটিতে সতরঞ্চি আর মাদুর পাতা। তার উপর মোটা খেশ আর সাদা চাদর। কয়েকটা তাকিয়াও আছে।

অনেকক্ষণ মায়ের আদর খাচ্ছে আহিরা। উজ্জয়িনী এক হাত মেয়ের পিঠে বোলাচ্ছে, অন্য হাতে চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছে। একটু দূরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে মুখে বই গুঁজে বসেছিল উত্তমা।

সে এবার মুখ তুলে বলল, 'অনেকক্ষণ তো হল, এবার মাকে জানা পাড়ায় কী ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি তখন! বল তো। ওঠ, ওঠ অনেক আদর হয়েছে।'

উজ্জয়িনী বুঝতে পারে বড় মেয়ের একটু মন খারাপ হয়েছে। আহিরাই মা-র কাছ থেকে বেশি আদর পায়, আশকারাও। মুখে কিছু না বললেও উজ্জয়িনী টের পায় উত্তমার অসহিষ্ণুতা। তা সে আহিরার চেয়ে এক বছরের বড় হয়ে এমন বড় হয়েছে, মার সামনে সামনে থাকলেও কখনও কাছে এসে হ্যাংলার মত আদর চাইতে আসে না। সে তার স্বভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখে।

'কেন, দিদিও তো বলতে পারত ওখান থেকে। সে বুঝি জানে না!'

উজ্জয়িনী পেকে উঠতে যাওয়া বচসা নির্মূল করতে গিয়ে বলে, 'উত্তমা

তো বই পড়ছে। সে একটা কাজের কাজ করছে। আর তুই তো কেবল সর্দারি মেরে কাটাচ্ছিস! তোদের কলেজ খুলল বলে, তখন তো পড়াটা দরকার হবে নাকি! অনলাইনে দেখে দেখে পরীক্ষা আর দেয়া যাবে না। তুই এখন কিছুই করছিস না। তুই বল, কী বলার আছে।'

'বলছি কি কার্তিক পুজোয় আগে পাড়ায় রাতের বেলায় কার্তিক ঠাকুর রেখে দিয়ে যেত। তো সে পুজো তো চলে গেছে। এখন দিনের বেলায় পাড়ায় কে যেন কার্তিক ফেলেছে। আর তা নিয়ে হুলুস্থুলু। থানা-পুলিস।'

উজ্জয়িনী খানিকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আহিরার মুখের দিকে।

আহিরা বলল, ' নীলুজেঠুকে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে।'

'আরে কেন! তাহলে তো আমাকে যেতে হয়। বুড়ো মানুষ, নিজের হাঁটু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তাঁকে যদি রাতের বেলায় হাজতবাস করতে হয়! ধাক্কা সামলাতে পারবেন কি! না এখনও বেশি রাত হয়নি। আমি একবার থানায় যাই।'

উত্তমা বই থেকে মুখ তুলেছে এবার। সে বলল, 'মা, অত উতলা হয়ো না।'

'কী বলিস রে, আমাদের পাড়ার লোক। প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর বিপদে পাশে থাকব না!'

'মা, আহিরাটা ওরকম হয়েছে। আর্ধেক কথা বলে ঘোঁট পাকায় সব বিষয়ে। নীলুজেঠু এখন বাড়িতেই আছেন। বুদ্ধি করে সোনাদাকে জার্মানিতে ফোন করে দিয়েছিলেন। সোনাদাই ফোনাফুনি করে বন্ধুদের লাগিয়ে উকিল দিয়ে জামিন করে নিয়েছে। এখন ওরা বাড়িতেই আছে।'

উজ্জয়িনী বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'আমি একবার ঘুরে আসি ওদের বাড়ি থেকে। কি বলিস?'

আহিরা এবার মুখ খুলেছে। 'যাবে যাও, কিন্তু সবটা জেনে যাও। বিষয়টা সাধারণ কার্তিক-ফার্তিক নয়। কেঁচোর নীচে কেউটে ব্যাপার। অনেকরকম জটিলতা আছে। সাধ করে ঘরে কুমির ডেকে আনবে হয়তো। বৈকুণ্ঠপুরের ঘটনার পরে বাবা তোমাকে এসব গণ্ডগোলে নাক গলাতে বারণ করেছে না!'

উজ্জয়িনী হাউস কোটের উপর একটা চুড়িদারের জামা চাপিয়ে সভ্যভব্য হয়ে বেরিয়ে পড়ছিল আর কি। আহিরার কথা সে কানে নিল। চুড়িদারের জামাটা খুলে রাখল। বলল, 'মনে হচ্ছে ঘটনাটায় দম আছে। বলতো বলতো, পরিষ্কার করে বলতো ব্যাপারটা কী ঘটেছে?' ধপ করে আবার আহিরার পাশে মেঝেয় বসে পড়ল উজ্জয়িনী।

'তুমি তো জানো নীলুজেঠিমা কেমন শুচিবাই মহিলা। আর করোনা আসায় সেই ছোঁয়াছুঁয়ি বাতিক এখন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গেছে। তিনি ঘরের কাজের লোক ছাড়া আর কাউকেই ঘরে ঢুকতে দেন না। আর কাজের লোককেও ঘরে ঢোকানোর আগে স্যানিটাইজার স্প্রে করে প্রায় চান করার মত করে ঘরে ঢোকান। তার বাতিকের ঠেলায় ফেরিওয়ালারাও তটস্থ থাকে। সহজে ওই বাড়ির দরোজায় যেতে চায় না।'

উত্তমা বই থেকে মুখ তুলে বার বার করে আহিরার দিকে চাইছিল। কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শেষ করলে সে গল্পের বইতে আবার ভাল করে মন দিতে পারে। এই করোনায় ঘরে আটকে থেকে থেকে উত্তমার বেশ অনেক বই পড়া হয়ে গেছে। কলেজ খোলার আগে এই বইটাও শেষ করে ফেলতে চায়। কিন্তু আহিরা কিছুতেই মূল কথায় যাচ্ছে না। উত্তমা যথেষ্ট বিরক্ত। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তোর হ্যাজানো থামা তো। শর্টে কিছু বলতে পারিস না! তখন থেকে এদিক ওদিক ড্রাম বাজিয়ে যাচ্ছে!'

উজ্জয়িনী অবাক হয়। তার শান্তশিষ্ট বড় মেয়ে এমন রুক্ষ কণ্ঠে কথা বলছে যে! এমন তো হবার কথা নয়! বাবা-মা দু'জনের আদর একা দিয়ে সে ভরিয়ে রেখেছে মেয়েদের। সে মেয়েদের বন্ধুও বটে। কলেজে পড়ানোর সময়টুকু বাদ দিয়ে সে তো মেয়েদের গায়ে গায়েই লেগে থাকে।

তাহলে! এতখানি অসহিষ্ণুতা কেমন করে জন্ম নিল! উজ্জয়িনী থমকাল। সে উঠে এল আহিরার পাশ থেকে। তবে কি বোনের প্রতি কোনও অসূয়া জন্ম নিয়েছে! উজ্জয়িনী উত্তমার পাশে বসে পড়ে বলল, 'কী বই পড়ছিস রে! খুব ইন্টারেস্টিং বুঝি!'

উত্তমা বলল, 'হ্যাঁ মা। এটা কাম্যুর 'দ্য প্লেগ'। পড়তে ভাল লাগছে।'

'তোর পড়া হয়ে গেলে আমাকে গল্পটা একটু শুনিয়ে দিস তো! আমার আর তোর মত ধৈর্য নেই বড় বড় বই পড়ার।'

উত্তমা মাথা নাড়ে। তারপর সামনে আহিরার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বল, মাকে পাশের বাড়ির ঘটনা শুনিয়ে দে।'

আহিরা দিদির দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করে। সেও দিদি উত্তমার অমন রাগী গলা আগে কখনও শোনেনি। 'জানো তো মা, সোনাদা তো নানারকম জিনিস পাঠায় ক্যুরিয়রে জার্মানি থেকে। দুপুর বেলায় কলিং বেল বাজিয়ে সেরকম একটা ঢাউস বাক্স দরোজায় রেখে চলে যায় ক্যুরিয়র সার্ভিসের লোক। নীলুজেঠিমা সেই বাক্স ভাল করে স্যানিটাইজ করতে করতে টের পায়, ব্যাগটা নড়ছে। নীলুজেঠিমা ভয় পেয়ে নীলুজ্যাঠাকে ডেকে আনে। নীলুজ্যাঠা সামনে এসে দেখে হ্যাঁ– ঢাউস ব্যাগটা নড়ছে। শুধু নড়া নয়, ভেতর থেকে একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ আসছে। নীলুজ্যাঠা জেঠিমার দিকে চেয়ে বলে, 'তোমার পাগল ছেলের কাণ্ড দেখেছ, এখন সে আমাদের কুকুরছানা পাঠিয়েছে। এখন কি আর আমাদের সে বয়স আছে যে কুকুর পুষতে পারব!'

উজ্জয়িনী বলল, 'দারুণ! জার্মানির শেফার্ড খুবই দামি আর মূল্যবান হয়। ওরা না পুষতে চাইলে, আমি নিয়ে নিতে পারি। সে যা দাম হয়, দেব।'

'আগে শোনোই না মা। নীলুজেঠু তখন নিজের হাতে সাবধানে ব্যাগ খুলে ফেলেছেন। জেঠিমা ড্যাবাড্যাবা চোখ মেলে রেখেছেন ব্যাগের উপরে। আর একটু বাদেই নীলুজেঠু ছিটকে দু-পা পেছনে।'

ওসি সাহেব বললেন, 'দেখুন, ম্যাডাম, এই কেসটা তো এখন শুধু বসিরহাট থানার বিষয় নয়, এটা সমাজকল্যাণ দপ্তর হয়ে নবান্ন পর্যন্ত চলে গেছে। আজকের কাগজ খুলে দেখুন সংবাদপত্র আমাদের, মানে পুলিশের প্যান্টুল খুলে নিয়েছে। মানে যে যেমন খুশি পেরেছে পুলিশকে, বিশেষ করে আমাদের থানাকে তুলোধোনা করেছে।'

'তাই বলে বুড়ো মানুষদুটিকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করবেন! ওদের কী দোষ!'

ওসি একটু তো তো করলেন। তারপর বললেন, 'আজই এই কেসের মীমাংসা করে ফেলব। সোজা রিপোর্ট দেব, বিদেশে থাকে যে ছেলে, সেই বাবা-মাকে উপহার হিসেবে এটি পাঠিয়েছে। ওদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই, আর এখানে একলা ফেলে রাখা বাবা-মাকে খুশি রাখতে যা কিছু উপহার হিসেবে পাঠায়। এই তো আমার বাড়ির পাশের এক নবদম্পতি সেদিন উপহার পেয়েছে অনলাইনে কালো কুচকুচে এক আরবি ঘোড়া। বোন-ভগ্নীপতিকে বিয়ের উপহার। কুয়েতের তেল কোম্পানিতে বড় চাকরি। সেই ঘোড়া নিয়ে বাড়ির পাশের যুবক যেমন উচ্ছ্বসিত, তেমনি সে বেকায়দায় পড়েছে। একজন লোক রাখতে হয়েছে ঘোড়া দেখা শোনার জন্য। বাড়ির গ্যারেজ থেকে নিজের গাড়ি সরিয়ে অন্যত্র রেখে সেখানে ঘোড়ার আস্তাবল হয়েছে। লোকজন দেখতেও আসছে, সে এক ভজকট ব্যাপার।'

● পরবর্তী সংখ্যায়

তাপস রায়

সরকারি আধিকারিক তাপস রায়ের জন্ম ১৯৬৩ সালের ১০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের হাবড়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ, পিএইচ ডি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার বই ১২টি। শেষতম বইটির প্রকাশ ২০১৭ সালের মে মাসে– 'নরম হয়ে আসে' (সিগনেট)। প্রবন্ধের বই ১টি– 'মিথ্যে মিথ্যে কবিতা (সুতরাং) ২০১৭। গল্পের বই ২টি। প্রকাশিত উপন্যাস ৭টি– এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পোড়ামাটির দেউল (আনন্দ পাবলিশার্স) ২০১৬, মানদাসুন্দরীর কাঁথা (আনন্দ পাবলিশার্স) ২০১৮; বন্দেমাতরম (একুশ শতক) ২০২২। *দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান, আজকাল, যুগশঙ্খ, অদ্বিতীয়া, নবকল্লোল, তথ্যকেন্দ্র, নন্দন, গৃহশোভা*সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রধান কাগজে তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাপস রায় বীরেন্দ্র পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মারক, সামসুল হক স্মৃতি পুরস্কার, বেদব্যাস পুরস্কার, বিনয় মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার, উত্তরণ সাহিত্য পুরস্কার, কবি নিত্যানন্দ পুরস্কার, সুতরাং পুরস্কার, প্রথম আলো পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সোহরাব হোসেন স্মারক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

এক নজরে হরিয়ানা

দেশ	ভারত
রাজধানী	চণ্ডিগড়
জেলা	২২টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৬৬
সরকার	
• রাজ্যপাল	সত্যদেব নারায়ণ আর্য
• মুখ্যমন্ত্রী	মনোহরলাল খট্টর (বিজেপি)
• বিধানসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (৯০ আসন)
• লোকসভা	১০ আসন
• উচ্চ আদালত	পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট
ক্ষেত্রফল	
• মোট	৪৪,২১২ বর্গকিমি (১৭,০৭০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	২১ম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	২৫,৩৫৩,০৮১
• ক্রম	১৮শ
• ঘনত্ব	৫৭৩/বর্গকিমি (১,৪৮০/বর্গমাইল)
সরকারি ভাষা	হিন্দি
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় ইউটিসি+০৫:৩০ (আইএসটি)
ISO 3166 code	IN-HR
ওয়েবসাইট	haryana.gov.in

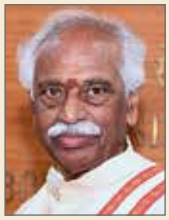
বন্দারু দত্তত্রেয়া
রাজ্যপাল

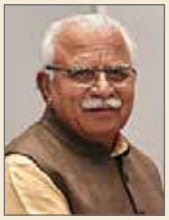
মনোহরলাল খট্টর
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

হরিয়ানা

সুরিন্দর এম ভরদ্বাজ ও চক্রবর্তী রাঘবন

ভারতের উত্তর-কেন্দ্রীয় রাজ্য হরিয়ানার উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব ও কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড চণ্ডিগড়, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড, পূর্বে উত্তর প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড দিল্লি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে রাজস্থান অবস্থিত। কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডিগড় শহর শুধু কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডটির রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, এটি হরিয়ানা ও পঞ্জাবেরও রাজধানী।

১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর ভাষার ভিত্তিতে সাবেক পঞ্জাব দু'ভাগে বিভক্ত হয়, পঞ্জাবিভাষী পঞ্জাব ও হিন্দিভাষী হরিয়ানা। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্জাবি সুবা গঠনের দাবি এবং পরবর্তীকালে পঞ্জাবের হিন্দিভাষী মানুষের বিশাল হরিয়ানা রাজ্য গঠনের স্বপ্নের প্রেক্ষিতে এ রাজ্য পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়।

হরিয়ানা শব্দটি এসেছে হরি (হিন্দু দেবতা বিষ্ণু) ও আয়ন (বাসস্থান/বাড়ি) অর্থাৎ ঈশ্বরের বাসস্থান থেকে। রাজ্যের ক্ষেত্রফল ১৭ হাজার ৭০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ২ কোটি ৫৩ লাখ ৫৩ হাজার ৮১।

ভূমিরূপ ও জল নিকাশ

হরিয়ানা দু'টি প্রধান ভৌতভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত: রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলজুড়ে পাললিক সমভূমি এবং উত্তর-পূর্বের অতি বন্ধুর সিবালিক পর্বতমালা (নিচু পর্বত-পাদদেশ অঞ্চলসহ)-র একটি ফালি। বাকিটা আরাবল্লি পর্বতমালার অংশ যা দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি দক্ষিণাঞ্চলীয় হরিয়ানার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পাললিক সমভূমির উচ্চতা ৭০০ থেকে ৯০০ ফুট (২১০ থেকে ২৭০ মিটার) এবং এর মধ্য দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। যমুনা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে অবস্থিত। সিবালিক পর্বতমালা থেকে অনেক মৌসুমি নদী এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এসব নদীর মধ্যে রাজ্যের উত্তর সীমান্তবর্তী ঘাগর উল্লেখযোগ্য, যা বহু দূর প্রবাহিত হয়ে সিন্ধু নদে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

মাটি

পার্বত্য উত্তর-পূর্বের ক্ষয়িষ্ণু ভূমি এবং রাজস্থানের থর মরুভূমির অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলেন হরিয়ানার মাটি সাধারণত গভীর ও উর্বর। রাজ্যের অধিকাংশ জমি আবাদী, তবে প্রচুর সেচ লাগে।

জলবায়ু

হরিয়ানার জলবায়ু গ্রীষ্মে গরম এবং শীতকালে অতি শীতল; মে-জুনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং জানুয়ারিতে (শীতলতম মাস) নিচের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে নেমে যায়। রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল শুষ্ক থেকে আধা শুষ্ক, শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিছুটা আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৮ ইঞ্চি (৪৫০ মিলিমিটার)। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। খাল (ক্যানেল) ও নলকূপের মাধ্যমে রাজ্যের সেচ ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও অঞ্চল স্থায়ী অনাবৃষ্টিপ্রবণ এলাকা, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। এর বিপরীতে যমুনা ও ঘাগরের শাখানদী অঞ্চলে প্রায়শই বন্যা হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ

হরিয়ানায় সামান্য কিছু প্রাকৃতিক গাছপালা রয়েছে। মহাসড়ক ও পতিত জমিতে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয়েছে। রাজ্যের উত্তরের অর্ধেক অঞ্চলের রাস্তা ও ক্যানেলের পাশে শিশম গাছ জন্মে। এছাড়া রাজ্যের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বাবলা গাছ ও গুল্ম দেখা যায়।

হরিয়ানা বৈচিত্র্যময় স্তন্যপায়ী প্রাণির আবাসস্থল। বৃহত্তর প্রজাতির মধ্যে আছে চিতা, শিয়াল, বুনো শুয়োর ও কয়েক ধরনের হরিণ। রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও প্রত্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণত এদের দেখা মেলে। এছাড়া ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী যেমন বাদুড়, কাঠবিড়ালি, বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়। নদীর আশেপাশে হাঁস দেখা যায়। কৃষি এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। এছাড়া ছোট ও বর্ণাঢ্য পাখি যেমন টিয়া, বান্টিং, মৌটুসি, বুলবুল ও মাছরাঙার দেখা মেলে। রাজ্যে বিভিন্ন প্রজাতির সাপের অস্তিত্ব আছে। এ সবের মধ্যে অজগর, ঘোড়া, ইঁদুর থেকে সাপ ও বিষাক্ত কেউটে ও ভাইপার। অন্যান্য সরীসৃপের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির টিকটিকি, ব্যাঙ ও কচ্ছপের বসতি আছে হরিয়ানায়।

উত্তর-পূর্ব হরিয়ানার যমুনানগরে দিনশেষে ফিরছে চাষিরা

কুরুক্ষেত্র এনআইটি

হেরিটেজ হোটেল নূরমহল

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের স্মারক

ব্রহ্মা সরোবর মন্দির

জনসংখ্যার বিন্যাস

হরিয়ানার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বাধিক। শিখ ও মুসলমানরা সংখ্যায় কম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু। এছাড়াও আছে একটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়। রাজ্যের অধিকাংশ শিখ জনসংখ্যার বসবাস উত্তর-পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, অপরদিকে মুসলমানদের বসবাস দিল্লিসন্নিহিত রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে। জাট (কৃষক সম্প্রদায়) হরিয়ানার কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ভারতের সশস্ত্র বাহিনিতেও এদের সংখ্যাধিক্য। হরিয়ানভি জনগণের '৩৬ জাতি' বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ধারণা রয়েছে। জাট, রাজপুত, গুর্জর, সাইনি, পাসি, আহির, রোর, মেভ, বিষ্ণোই , হরিজন, আগরওয়াল, ব্রাহ্মণ, খত্রী ও ত্যাগী প্রভৃতি জাতি এই ৩৬ জাতীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বসতির ধরন

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হরিয়ানার জনসংখ্যার প্রায় তিন-চর্তুথাংশ গ্রামে বাস করে। তবে বাণিজ্যিক, শিল্প ও কৃষিবাজারকেন্দ্রিক শহরের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। রাজ্যের বৃহত্তম নগরের মধ্যে ফরিদাবাদ, রোহতক, পানিপথ, হিসর, সোনিপথ ও কার্‌নাল উল্লেখযোগ্য। মধ্য হরিয়ানার রোহতক এবং উত্তর-পশ্চিমের হিসর ছাড়া অধিকাংশ শহর রাজ্যের

পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

কৃষি

কৃষিসমৃদ্ধ রাজ্য হরিয়ানা কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডারের গম ও চালের বড় যোগানদাতা। এছাড়া রাজ্যে তুলা, তেলবীজ, সরিষা, মিলেট, ছোলা, আখ, জর্দা, ভুট্টা ও আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গরু, মোষ ও ষাঁড়ের খামারের জন্য হরিয়ানা বিখ্যাত।

হরিয়ানার কৃষি উৎপাদন তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের সময় তুঙ্গে ওঠে। গত শতকের ষাটের দশকের বিশ্বব্যাপী ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের ফলে কৃষিতে বিপুল বিনিয়োগ হয় যার ফলশ্রুতিতে সেচ, সার ও বীজের গবেষণা নতুন মাত্রা লাভ করে। এ শতকের প্রথম দু'দশকে রাজ্যের কর্মশক্তির প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত।

উৎপাদন

কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের উন্নয়নে হরিয়ানার অগ্রগতি বিরাট। এ ধরনের কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তুলা ও আখ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। এর সঙ্গে বেড়েছে খামার যন্ত্রপাতি উৎপাদন।

কারনালে ছাছারৌলি দুর্গ

হরিয়ানার গুরগাঁয়ের আইসিটি গ্রাড ভারত

হরিয়ানার কৃষিক্ষেত্রে চাষিবউ

হরিয়ানার স্টার টেম্পল

পিঞ্জর গার্ডেন

হরিয়ানা রসায়ন শিল্প ও বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য শিল্প উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য। হরিয়ানা সাইকেল উৎপাদনে বিখ্যাত।

পরিবহন

হরিয়ানা সুপ্রাচীনকাল থেকে আশেপাশের অঞ্চল ও ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সুসংযুক্ত। ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ও উত্তরাঞ্চলীয় রেলওয়ের প্রধান লাইনসহ প্রধান প্রধান মহাসড়ক ও রেলওয়ে লাইন রাজ্যের ওপর দিয়ে দিল্লি চলে গেছে। হরিয়ানার বিভিন্ন নগর ও শহরের মধ্যে রাজ্য সরকার মালিকানাধীন বাস সার্ভিস চালু আছে। চণ্ডিগড়ে একটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

সাংবিধানিক কাঠামো

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মত হরিয়ানার সরকার কাঠামো ১৯৫০ সালের জাতীয় সংবিধান কর্তৃক নির্দেশিত। ভারতের রাষ্ট্রপতির নিয়োগকৃত রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান। রাজ্যের বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গভর্নরকে সহায়তা ও পরামর্শ দান করে থাকে। হরিয়ানা আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর সদস্যরা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পঞ্জাবের সঙ্গে রাজ্যের অভিন্ন উচ্চ আদালত।

হরিয়ানায় ৪টি বিভাগ– প্রত্যেকটি বিভাগ বেশ কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের দেখভাল করেন। জেলার দেখাশুনোর দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারের হাতে। গ্রাম পর্যায়ে স্ব-শাসিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

জেলা, মহকুমা হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ গোটা হরিয়ানার স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল সেবা প্রদান করে। ১৯৯০ সালের প্রথম থেকে রাজ্যের সকল গ্রামে নিরাপদ সুপেয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রচলিত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঋণ দিয়ে থাকে।

শিক্ষা

রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারে রাজ্য ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য হাজার হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের এই একবিংশ শতাব্দীতেও সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকশো ছোট ছোট কলেজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হরিয়ানার বিভিন্ন ছোট বড় নগর-শহরে যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। কারনালে অবস্থিত জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯২৩), কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬), কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত জাতীয় প্রকৌশল ইনস্টিটিউট (১৯৬৩), রোহতকে অবস্থিত মহাঋষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬), চৌধুরী চরণ সিং হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০), হিসরে অবস্থিত বিখ্যাত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গুরু জম্ভেশ্বর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৫) উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সাধারণ শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য বিশেষায়িত কলেজসহ বহু কলেজ শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত ভূমিকা রেখে চলেছে।

সাংস্কৃতিক জীবন

হরিয়ানার সাংস্কৃতিক জীবন এর কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঋতুভিত্তিক এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীনির্ভর। রঙের উৎসব

হোলি বসন্তোৎসব– বয়স ও সামাজিক অবস্থাননির্বিশেষে সবাই একে অপরের গায়ে রঙ মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। ভগবান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মস্মারক অনুষ্ঠান জন্মাষ্ঠমী হরিয়ানার বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ যুদ্ধ-বিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্যে যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন, যা শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা নামে মহাভারতে সংকলিত, সেই কুরুক্ষেত্র এ রাজ্যেই অবস্থিত। অন্যান্য দেবতা ও সাধু-সন্তের সম্মানে উৎসবও রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর আছে গৃহপালিত পশুর মেলা– রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এসব মেলা বসে।

হরিয়ানায় অনেক তীর্থস্থান অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ স্নানোৎসবে ভারতবর্ষের প্রান্তের লাখলাখ তীর্থযাত্রী অংশগ্রহণ করে। হরিয়ানার কেন্দ্রস্থল পেহোবা একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত পেহোবা পিতৃতর্পণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

হরিয়ানার ঐতিহ্যবাহী বাড়িকে বলে হাভেলি– এসব হাভেলি অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন, বিশেষ করে সিংহদরজা ও মঞ্চের বাহার দেখবার মত। এসব সিংহদরজা মধ্যযুগের স্মৃতিবাহী ও একইসঙ্গে নান্দনিক। এসব সুরম্য মঞ্চে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঞ্চের বাহার হাভেলি মালিকদের সামাজিক মর্যাদার ইঙ্গিতবাহীও বটে।

দেশি হরিয়ানভি লোকসংগীত, হরিয়ানভি সংগীতের একটি রূপ, যা রাগ ভৈরব, রাগ কাফি, রাগ জয়জয়ন্তী, রাগ ঝিনঝোটি ও রাগ পাহাড়ি-র উপর ভিত্তি করে রচিত। মৌসুমী গান, ব্যালাড, আনুষ্ঠানিক গান (বিবাহ ইত্যাদি) এবং ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনী যেমন পুরাণ ভগত গাইতে সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব উদযাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়) প্রেম ও জীবন সম্পর্কিত গানগুলো মাঝারি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় গান কম অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। অল্পবয়সী মেয়েরা ও মহিলারা সাধারণত বিনোদনমূলক গান, ঋতু, প্রেম সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব সম্পর্কিত গান গায়, যেমন ফাগন (নামহীন ঋতু/মাসের গান), কটক (নামহীন ঋতু/মাসের গান), সম্মান (নামহীন ঋতু/মাসের গান), বান্দে বান্দি (পুরুষ-মহিলা যুগল গান), সাথীনী (মহিলা বন্ধুদের মধ্যে আন্তরিক অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার গান) গেয়ে থাকেন। বয়স্ক মহিলারা সাধারণত ভক্তিমূলক মঙ্গলগীত (শুভ গান) ও আনুষ্ঠানিক গান যেমন ভজন, ভাট (বধূ বা কনের মাকে তার ভাইয়ের দেয়া বিবাহের উপহার), সাগাই, বান (হিন্দু বিবাহের আচার যেখানে প্রাক-বিবাহের উৎসব শুরু হয়), কুয়ান গায়। পূজন (একটি প্রথা যা একটি শিশুর জন্মকে স্বাগত জানাতে কূপ বা পানীয় জলের উৎসের পূজা করে), সাঁঝি ও হোলি উৎসব।

ইতিহাস

বেদ– বৈদিক ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আজকের হরিয়ানা অঞ্চল থেকেই পল্লবিত হয়েছিল। আর্য ঋষিরা এসব সংস্কৃত দলিলের লেখক, যারা উত্তর থেকে এখানে এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ ও ১৫০০ অব্দের মধ্যে। হরিয়ানা হিন্দুধর্মেরও জন্মস্থান, যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আকার লাভ করে এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় বিকশিত হয়।

বহিরাক্রমণের প্রবেশমুখে অবস্থিত হওয়ায় হরিয়ানা হাজার বছর জুড়ে বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬-এ মহাবীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। অঞ্চলটি ভারতের ইতিহাসের অনেক ভয়ংকর যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ১৫৫৬ সালে এখানেই আকবরের হাতে আফগান বাহিনি পরাজিত হয়; এবং ১৭৬১ সালে আহমেদ শাহ আবদালি মারাঠীদের পর্যুদস্ত করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পথ সুগম করে দেন। ১৭৩৯ সালে কারনালের যুদ্ধও গুরুত্বপূর্ণ, যখন পারস্যের নাদের শাহ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন।

হরিয়ানার আদি বদ্রী

হরিয়ানার স্মার্ট গ্রাম

হরিয়ানা–শিল্প–সংস্কৃতির অনুপম চারণক্ষেত্র

হরিয়ানার ঐতিহ্যবাহী নাচ

বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যসহ অঞ্চলটি ১৮০৩ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে সমর্পণ করা হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এটি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং ১৮৫৮ সালে হরিয়ানা পঞ্জাবের অংশে পরিণত হয়। হরিয়ানা ও পঞ্জাবের সংযুক্তি ছিল খুবই বাজে একটা ব্যাপার, কারণ এ দু'টি অঞ্চলের ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈপরীত্য ছিল ব্যাপক। একদিকে পঞ্জাবের পঞ্জাবিভাষী শিখ, অন্যদিকে হরিয়ানার হিন্দিভাষী হিন্দু। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হরিয়ানায় পৃথক রাজ্যের দাবি প্রকট হয়ে ওঠে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা লালা লাজপত রায় এবং আসফ আলী এর নেতৃত্ব দেন। আর স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের দাবি তোলেন নেকিরাম শর্মা।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হরিয়ানা পঞ্জাবের পক্ষেই রয়ে যায়– তবে স্বাধীন ভারতে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি শিখ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯৬০-এর দিকে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। শেষে পঞ্জাব পুনর্গঠন আইন অনুসারে ১৯৬৬ সালে হরিয়ানা পঞ্জাব থেকে আলাদা হয়ে ভারতের সপ্তদশ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

সূত্র এনসায়ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

• অনুবাদ মানসী চৌধুরী

বেসন মসলা রুটি

মিশ্রডাল

হেঁসেলঘর

হরিয়ানার ১৭ নিজস্ব খাবার

হরিয়ানা ভারতের অন্যতম ধনী রাজ্য যার মানুষেরা বিনয়ী ও দয়ালু। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বৃত্তি কৃষি, গো-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন। হরিয়ানভীদের খাদ্য নিরামিষ– এতে প্রচুর দুধ-ঘির ব্যবহার থাকে। হরিয়ানাকে 'ল্যান্ড অফ রুটি' নামেও অভিহিত করা হয়। এখানে হরিয়ানার ১৭টি নিজস্ব পদের তালিকা দেয়া হল:

সিংড়ি কি সবজি

১. সিংড়ি কি সবজি

সিংড়ি বা কের সিংড়ি হচ্ছে শুকনো মরুভূমির মটরশুটি– এত সুস্বাদু যে দেখলেই জিবে জল চলে আসে। এ সবজিটি তৈরি করতে মটরশুটি দানা সামান্য ভেজে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সামান্য লবণ দিয়ে মিনিট-পনের সিদ্ধ করা হয়। তারপর কড়াইয়ে আমচুর ও বেরি ফল মিশিয়ে রান্না করা হয়। পরিবেশনের সময় এর সঙ্গে দইও মেশানো যেতে পারে।

২. বেসন মসলা রুটি

ডালের বেসন, আটা ও ঘি দিয়ে বেসন মসলা রুটি প্রস্তুত হয়। এর সঙ্গে কাঁচা লংকা বাটা, গুঁড়ো লংকা, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও আমচুর মেশানো হয়। রায়তা বা সবজি দিয়ে এ রুটি খাওয়া হয়।

৩. মিশ্রডাল

মিশ্র ডাল আপনার স্বাস্থ্য ও রসনাবিলাসের উপাদান। বিভিন্ন ডাল (যেমন চানা, তুর, মসুর, মুগ) মিশিয়ে বিভিন্ন মসলা ও ঘি দিয়ে রান্না করা অতি উপাদেয় ঘন নির্জলা ডাল। অধিকাংশ মানুষ এ ডাল সাদাভাত, জিরা ভাত বা আটার রুটির সঙ্গে খেতে ভালবাসে।

৪. হর ধনিয়া চোলিয়া

হর ধনিয়া চোলিয়া হরিয়ানার নিজস্ব থালি। চোলিয়া বা কাঁচা চানার সঙ্গে পেঁয়াজ, গাজর ও বিভিন্ন মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। ভাত বা রুটির সঙ্গে এ সবজি খাওয়া হয়।

৫. কড়ি পকোড়া

ঘন টক-দইয়ের সঙ্গে ছোলার ময়দা কড়ি হরিয়ানা ও পঞ্জাবের অনবদ্য খাবার। ভাজা পকোড়ার সঙ্গে কড়ি ভারতের অন্যতম সহজপাচ্য খাবার।

হর ধনিয়া চোলিয়া

কড়ি পকোড়া

মালপোয়া

মিঠে চাওল

ভুরা রুটি ঘি

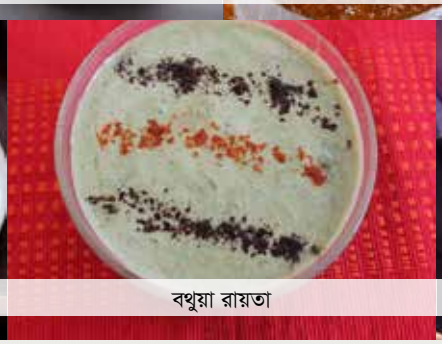

বথুয়া রায়তা

কাচরি কি চাটনি

৬. মালপোয়া

মালপোয়া হচ্ছে মিষ্টি প্যান কেকের ভারতীয় সংস্করণ। গরম গরম ভাজা ফুলকো লুচির মত তেল বা ঘিয়ে ভাজা পিঠা। কোথাও কোথাও বারডির (ঘন দুগ্ধজাত মিষ্টি পদ) সঙ্গে মালপোয়া খেতে দেওয়া হয়।

৭. মিঠে চাওল

মিঠে চাওল (মিষ্টি ভাত) তৈরি হয় বাসমতি চাল, ঘি, চিনি, এলাচ ও জাফরান সহযোগে। হরিয়ানার বাসমতি চাল সর্বোত্তম। এ থালিটি খুব বিখ্যাত– প্রত্যেকেরই এটি অন্তত একবার চেখে দেখা উচিত।

৮. বাজরা খিচড়ি

খিচুড়ি সারাদেশেই জনপ্রিয়। তবে হরিয়ানার খিচড়ির বিশেষত্ব এই, এটি চালের পরিবর্তে বাজরা দিয়ে তৈরি হয়। বাজরা খিচড়ি রান্না করতে বাজরা সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর বাজরা ও মুগডাল একসঙ্গে ধুয়ে মসলা প্রভৃতি দিয়ে প্রেশার কুকারে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমরা সবাই জানি যে, বাজরা একটা স্বাস্থ্যকর খাবার এবং এটা খুব বিরুদ্ধ-পরিবেশে সহজে জন্মে। যারা ভাত খেতে চান না তাদের জন্যই বিশেষভাবে বাজরা খিচড়ি রান্না করা হয়। তবে এর সঙ্গে চালও যোগ করতে পারেন।

১২. কাচরি কি চাটনি

কাচরি কি চাটনি হরিয়ানা-রাজস্থানের জনপ্রিয় থালি। এ চাটনি তৈরি করতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাচরি সবজি ব্যবহৃত হয়। কাচরি হচ্ছে এক ধরনের বুনো শসা যা দেখতে অনেকটা তরমুজের মত– তবে আকারে খুব ছোট। কাচরি কি চাটনি তৈরি হয় কাচরি, আদা, পেঁয়াজ, অন্যান্য মসলা ও দই দিয়ে।

১৩. মেথি গাজর

মেথি গাজর হচ্ছে সুস্বাদু মসলাদার হালকা মিষ্টি একটা গাজরের পদ। মেথি শাক ও গাজর বিভিন্ন মসলা, গরম মসলা, লবণ ও এক চিমটি চিনি দিয়ে ভাজা। মেথি গাজর একটা সবজি পদ, রুটির সঙ্গে খাওয়া হয়।

১৪। আলসি কি পিন্নি

আলসি কি পিন্নি একটা মিষ্টি পদ যা তৈরি হয় আলসি (তিসি) বীজ, ময়দা, চিনি, বাদাম ও ঘি দিয়ে। সবগুলো উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট গোল্লা পাকানো হয়। এই মিষ্টি পদটিও খুব স্বাস্থ্যকর এবং ওমেগা ও লৌহসমৃদ্ধ।

১৫. টমেটোর চাটনি

টমেটোর চাটনি মসলাদার, জিভে জল আনা ঈষৎ টক চাটনি। টমেটোর সঙ্গে

৯. ভুরা রুটি ঘি

ভুরা ঘি রুটি হচ্ছে মিষ্টি, মসলাদার থালি যা ভুরা (চিনির গুড়ো) ঘি রুটির সঙ্গে মাখিয়ে তৈরি করা হয়। হরিয়ানভীরা সাধারণত শেষপাতে এ খাবারটি খেয়ে থাকে।

১০. বথুয়া রায়তা

বথুয়া রায়তা হচ্ছে দইয়ের রান্না যা খুবই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু। বথুয়া বা বেথো শাক এন্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর ও নানা ভিটামিনে সমৃদ্ধ। বেথো শাক ভাল করে কুচি কুচি করে কেটে জিরা গুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে তাতে দই মেশানো হয়। হরিয়ানার প্রায় সকল খাবারে রায়তা পরিবেশন করা হয়।

১১. বাজরা আলু রুটি

বাজরা আলু রুটি হরিয়ানার আরেকটি জনপ্রিয় থালি। হরিয়ানায় শীতকালে সাধারণত বাজরা খাওয়া হয়। কারণ বাজরা শরীরে প্রচুর তাপ উৎপাদন করে বলে জনপ্রিয় ধারণা। বাজরা আলু রুটি হচ্ছে বাজরা রুটির সঙ্গে বিভিন্ন মসলাসহযোগে আলু ভর্তা। এমনকি রুটির সঙ্গে পেঁয়াজকুচিও মেশানো হয়। মাখন ছড়িয়ে দিয়ে এ রুটি খাওয়া হয়। পাশে রাতাও দেওয়া যেতে পারে। পেঁয়াজ, আদা, মসলা, লবণ ও এক চিমটি চিনি মিশিয়ে এ চাটনিটা তৈরি করা হয়। পকোড়ার সঙ্গে বা যে-কোন খাবারের পাশে এ চাটনি পরিবেশন করা হয়।

১৬. দই-বড়া

দই-বড়া গোটা উত্তর ভারতে বিখ্যাত। এ পদের উপাদান হচ্ছে দই ও বড়া। বড়া হচ্ছে পকোড়া ভেজে জলে ভেজানো। তারপর এর সঙ্গে বিভিন্ন চাটনি, মরিচগুঁড়ো, লবণ ও জিরাগুঁড়ো মেশানো হয়। এ পদটি ঠাণ্ডা করে খেতে হয়।

১৭. রাজমা চাওল

এটিও উত্তর ভারতের আরেক বিখ্যাত পদ। লাল রাজমা মটরশুটি সারারাত ভিজিয়ে বা সেদ্ধ করে এর সঙ্গে নানা মসলা মাখিয়ে গ্রেভি করা হয়। এই সুস্বাদু রাজমা সবজি গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে হয়। রাজমা যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ।

হরিয়ানার সকল পদ যেমন লোভনীয় তেমনি উপকারী। হরিয়ানায় গেলে মিষ্টির বিভিন্ন পদ থেকে চাটনি থেকে মিশ্র ডাল– কোনওকিছুরই স্বাদ নিতে ভুলবেন না। • অনুবাদ মানসী চৌধুরী

চলচ্চিত্র

নিজের সময়ের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন মহানায়িকা

ষাট-সত্তরের দশকে রূপোলি পর্দায় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। অথচ খ্যাতির শিখরে থাকাকালীন আচমকাই একদিন স্বেচ্ছায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। কারণটা আজও অজানা। তবে অন্তরালে চলে গেলেও চর্চায় তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেনও। কারণ তিনি যে সুচিত্রা সেন! বাংলা ছবির জগতের এক সময়ের অধিশ্বরী! গ্ল্যামার কুইন! মহানায়িকা। লিখেছেন পরমা...

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, প্রখর সম্ভ্রম আর দাপুটে অভিনয়– এই সবকিছু দিয়ে সুচিত্রা সেন জিতে নিয়েছিলেন প্রতিটা বাঙালির মন। ভীষণ ভার্সেটাইল ছিলেন তিনি। একদিকে স্নিগ্ধ আবার অন্যদিকে দৃঢ়। আর তাঁর সেই ভীষণরকম বাঙ্ময় দু'টো চোখ আর গভীর চাহনি, যার জন্য উথালপাথাল হত প্রত্যেকটা বাঙালির মন! আজও একইভাবে বাঙালির ইমোশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন মহানায়িকা। অভিনয় জগতেই কি শুধু তাঁর অবদান?

তা কিন্তু নয়! অভিনয় জগতের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশন দুনিয়াতেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর ফ্যাশন সেন্স আর স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে আজও চর্চা হয়। এমনকি সুচিত্রা সেনের তৈরি ফ্যাশন ট্রেন্ড আজও আমরা ফলো করে চলেছি।

তবে তাঁর ফ্যাশন সেন্স আর স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে বলতে গেলে যেটা সবার আগে বলতে হয়, সেটা হল– নিজের সময়ের থেকেও অনেকটা এগিয়েছিলেন তিনি! কারণ ইন্ডিয়ান থেকে ওয়েস্টার্ন আউটফিট, শাড়ি থেকে সুইম স্যুট, স্লিভলেস ব্লাউজ থেকে থ্রি-কোয়ার্টার হাতা ব্লাউজ– সব কিছুতেই তিনি সমানভাবে সাবলীল ছিলেন। আর শাড়ির সঙ্গে শ্রাগ, স্টোল অথবা স্কার্ফের স্টাইলেও স্বতন্ত্র তিনি। আজও প্রতিটা মেয়ের কাছে স্টাইল আইকন সুচিত্রা সেন কখনও দেবদাসের 'পারু', কখনও-বা সপ্তপদীতে 'রিনা ব্রাউন'– প্রতিটা চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। ঠিক সেভাবেই প্রত্যেকটা ছবিতে তাঁর পোশাক-আশাক, চলন-বলন, স্টাইল– এই সবকিছুর মধ্যেই ছিল স্বাতন্ত্র্য। আর এভাবেই যেন রূপোলি পর্দা শাসন করে গিয়েছেন সুচিত্রা সেন।

লম্বাটে ভরাট মুখ, ছোট কপাল, কথা বলা– দু'টো গভীর চোখ, সুগঠিত নাক, একঢাল চুল আর সেই মোহময়ী হাসি– এটাই এখনও বাঙালির নস্টালজিয়া। অথচ সুচিত্রা সেনের মুখের গড়ন কিন্তু গড়পরতা বাঙালি মেয়েদের মত ছিল না। আর যেহেতু তাঁর ওভাল শেপ ফেস ছিল, তাই সবরকম মেক আপেই তাঁকে মানিয়ে যেত। তাঁর মোটা করে আঁকা ভুরু আর গাঢ় করে আঁকা ঠোঁট। সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হল তাঁর বিউটি স্পট। কারণ মহানায়িকার মেক আপ আর্টিস্টের হাতের জাদুতেই প্রাণ পেত ওই বিউটি স্পটটি। অথচ বছরের পর বছর একটুও এদিক ওদিক হয়নি মহানায়িকার বিউটি স্পট!

সেই সময় জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর হেয়ারস্টাইলও। কখনও-বা খোলা চুলে তো কখনও বুফোঁ স্টাইল আর ফ্রেঞ্চ রোল স্টাইলে স্বকীয়তার ছাপ রেখে গিয়েছেন। সানগ্লাসের স্টাইলেও ছিল তাঁর নিজস্বতার ছোঁয়া। এই যেমন, হাল ফ্যাশনের কয়াট আই গ্লাসেস। এটাও কিন্তু মহানায়িকারই স্টাইল স্টেটমেন্ট! আবার তাঁর অভিনয় জীবনের শেষের দিকে কালো সানগ্লাসে চোখ ঢেকেই তাঁকে বেশির ভাগ দেখা যেত।

শুধু কি মেকআপ বা হেয়ারস্টাইল? পোশাক-আশাকেও তিনি ছিলেন সময়ের থেকে এগিয়ে এবং সাহসীও। পোশাক-আশাক নিয়ে এক্সপেরিমেন্টও করেছেন। আর মহানায়িকার সেই সময়কার স্টাইলই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কেমন ছিল সেই সময়ে তাঁর স্টাইল? পশ্চিমি পোশাক ক্যারি করতেন অনায়াসে। এই যেমন– জাম্পস্যুট। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে বেশ ফ্যাশনে ইন জাম্পস্যুট। মনে হতেই পারে, এটা নতুন ট্রেন্ড। কিন্তু না! সুচিত্রা সেনও সেই সময় পরেছিলেন জাম্পস্যুট! শিমারি জাম্পস্যুট, কিটেন হিলস আর ডায়মন্ড ইয়াররিংসে মোহময়ী মহানায়িকা।

তাহলে থাই হাই স্লিটই-বা বাদ যাবে কেন? থাই হাই স্লিট স্কার্ট বা ড্রেস অথবা কুর্তিও আজকাল বেশ দেখা যাচ্ছে। হালের নায়িকারাও বেশ পরছেন। কিন্তু এই স্টাইলটাও এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন! থাই হাই স্লিট স্কার্ট, ওভারসাইজড সানগ্লাস আর মাথায় হ্যাট– যার আবেদনই আলাদা! এ তো নয় গেল সাহসী ওয়েস্টার্ন ড্রেসের কথা।

ইন্ডিয়ান ড্রেসেও রেখেছিলেন নিজের সিগনেচার মার্ক। যেমন– শাড়ি উইথ শ্রাগ অ্যান্ড স্কার্ফ। এটাও ছিল তাঁর তৈরি স্টাইল স্টেটমেন্ট। সুতি-শিফন-কাঞ্জিভরম সবকিছুই অনায়াসে ক্যারি করতেন মহানায়িকা। হাকোবা শাড়ি তাঁর অত্যন্ত পছন্দের। সাদা বেনারসির প্রতিও টান ছিল তাঁর! আর দুর্দান্তভাবে ক্যারি করতেন নেট শাড়ি। নেট শাড়ির সঙ্গে কানে হীরের ড্যাঙ্গলার, আঙুলে স্টেটমেন্ট রিং, চোখে উইঙ্গড আইলাইনার আর সেই ভুবনভোলানো হাসি! শুধু কি তা-ই? ফ্যাশনে ফিউশনও ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। শাড়ির উপর শ্রাগ, গলায় স্কার্ফ আর চুলে ফ্যাশনেবল একটা খোঁপা– এভাবেই স্টাইলে নিজস্বতার ছাপ রেখেছিলেন মহানায়িকা। আবার অন্যদিকে, তাঁর শাড়ির সঙ্গে পাম্পস আর সুপারসাইজড ক্লাচের স্টাইল সবসময়েই ফ্যাশনে ইন! পাশাপাশি, ব্লাউজের কাট নিয়েও এক্সপেরিমেন্ট চালাতেন সুচিত্রা সেন। কখনও স্লিভলেস তো কখনও থ্রি-কোয়ার্টার ব্লাউজে সৌন্দর্যকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছিলেন।

• পরমা সংস্কৃতিকর্মী

উন্নয়ন

গোবর-ধন

আবর্জনা থেকে সম্পদ

আবর্জনা শুধুমাত্র পরিবেশের দূষণ ঘটায় না, স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। শুধু তাই নয় আবর্জনা জমা হলে সেই জায়গায় অন্য কাজও করা যায় না। এইসব সমস্যা সমাধান করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সূচনা করেন। সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন শহরাঞ্চল ২.০ চালু হয়েছে। এর লক্ষ্য হল 'বর্জ্যমুক্ত শহর' তৈরি করার একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা। এই মিশনের মাধ্যমে শহরগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্যমুক্ত করা হবে, শহরগুলোর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় ধরে দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। যতটা নজর দেওয়া উচিত ছিল, ততটা দেওয়া হয়নি। ফলে দেশের যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা জমা হত। দৃশ্যদূষণ দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনেই দেখতে পাচ্ছি। এখন মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলেন না। এমনকি তিন-চার বছর বয়সি ছোট শিশুরাও গুরুজনদের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলতে নিষেধ করেন। পথে, জনসাধারণস্থলে কাগজ, নোংরা ফেলার মত অভ্যাস বর্জন করতে হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যত মজবুত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইন্দোরে এশিয়ার বৃহত্তম বায়ো-সিএনজি প্লান্ট 'গোবর-ধন'-এর উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, বায়ো সিএনজি প্লান্টের এই উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রামের বাড়িঘর ও পশুপাখির খামার থেকে নির্গত বর্জ্য একপ্রকার গোবর ধন। এই উদ্যোগের ফলে মানুষ রোগ ও দূষণ থেকে মুক্তি পাবে, বর্জ্য জ্বালানিতে রূপান্তরিত হবে। এ জ্বালানিতে যানবাহনও চলতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রচারাভিযানটি ভারতের শহরগুলোকে পরিষ্কার, দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। এ প্রকল্প প্রাকৃতিক গ্যাস ও সারের জন্য কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি দেশে দূষণমুক্ত পরিবেশ ও স্বচ্ছ শহরের বার্তা দেবে। সরকারের এ প্রচেষ্টা ভারতকে তার জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সাহায্য করবে। অসহায় গবাদিপশুর আবাসস্থলের সমস্যাও দূর করবে। একই সময়ে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্বের ওপর জোর দিয়ে সরকারের লক্ষ্য হল আরও বেশিসংখ্যক শহরকে জলসমৃদ্ধ করা। • নিইস

পেট্রোলে ইথানলের মিশ্রণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

• ২০১৪ সালের আগে ভারত মিশ্রণের জন্য প্রায় ৪০০ মিলিয়ন লিটার ইথানল পেত। বর্তমান সময়ে মিশ্রণের জন্য ৩০০০ মিলিয়ন লিটারের বেশি ইথানল সরবরাহ করা হয়। এর ফলে চিনিকলগুলোর উন্নতি হয়েছে এবং আখ চাষিরাও উপকৃত হয়েছেন।

• ৭-৮ বছর আগে ভারতে ইথানল মিশ্রণ ১%, ১.৫%, ২% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমান সময়ে গ্যাসালিনে মিশ্রিত ইথানলের পরিমাণ প্রায় ৮%। গত সাত বছরে, মিশ্রণের জন্য ইথানলের সরবরাহও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

• বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে কয়লাপ্রধান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও খড় ব্যবহার করবে। এটি কৃষকদের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করবে পাশাপাশি কৃষকরা কৃষি বর্জ্য থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগও পাবেন।

সরকার হাজার হাজার একর জমি পরিষ্কার করছে

• সরকার স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে হাজার হাজার একর জমিতে পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ টন বর্জ্য অপসারণের জন্য কাজ করছে। এইসব জমে থাকা বর্জ্য দীর্ঘদিন ধরে বায়ু ও জল দূষিত করছে এবং এর থেকে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান মহিলাদের অধিকার এবং শহর ও গ্রামের সৌন্দর্যায়নের উপরেও লক্ষ্য রেখেছে। সিক্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের ওপর এখন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে আবর্জনার পাহাড়গুলোকে গ্রিন জোনে পরিণত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২০১৪ সালের তুলনায় দেশে আবর্জনা নিষ্কাশন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে একক ব্যবহারের প্লাস্টিকের প্রয়োগ রোধ করতে ১৬০০-এর বেশি উপাদান পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

• আগামী দুই বছরে, সরকার ৭৫টি পৌরসভায় গোবর-ধন বায়ো সিএনজি প্ল্যান্ট স্থাপন করতে চায়।

গোবর-ধন (বায়ো-সিএনজি) প্ল্যান্টের বৈশিষ্ট্য

• গোবর-ধন (বায়ো-সিএনজি) প্ল্যান্ট প্রতিদিন ৫৫০ টন পৃথকীকৃত সিক্ত জৈব বর্জ্য পরিশাধেন করতে পারে।

• কারখানাটি প্রতিদিন ১৭.০০০ কিলোগ্রাম সিএনজি এবং ১০০ টন জৈব সার তৈরি করতে পারে।

• এই কারখানাটি একটি জিরো-ল্যান্ডফিল মডেলের উপর নির্মিত হয়েছে, যার মানে পরিবেশবান্ধব এই প্রকল্প থেকে কোনও বর্জ্য উৎপাদন হবে না। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, সার হিসাবে জৈব কম্পোস্টের সঙ্গে সবুজ শক্তি প্রদানের মত একাধিক পরিবেশগত সুবিধাও দেবে প্ল্যান্টটি।

• এই প্ল্যান্টে১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ইন্দোর পুরসভা এই প্ল্যান্টে উৎপাদিত ন্যূনতম ৫০ শতাংশ সিএনজি কিনে নেবে। এর সাহায্যে চালানো হবে ৪০০টি বাস।

• বাকি সিএনজি খোলা বাজারে বিক্রি করা হবে। জৈব সার কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রতিস্থাপনে সাহায্য করবে।

মনীষী

বি আর আম্বেদকর

মানুষকে দাস বানিয়ে অনেকেই সম্রাট হয়েছে, কিন্তু আজ আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানব, যিনি সাধারণ মানুষকে দাসত্বের বাঁধন ছিন্ন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। সাম্যের প্রতীক ভারতরত্ন ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচনা করেন। তিনি দলিত ও অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। বি আর আম্বেদকর বলতেন, 'আমি এমন ধর্মকে মানি যে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়।' কিন্তু সারা দেশের জন্য অনেক মহৎ কর্ম করা এই লোকটি তার জীবনের প্রথমদিকে সমাজের দ্বারা যে পরিমাণ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়েছেন তা মনে হয় না অন্য কেউ হয়েছেন, এবং সেই সমস্ত অপমান ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বি আর আম্বেদকর ভারতবর্ষের প্রথম আইনমন্ত্রী হন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য নতুন আইন রচনা করেন যা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তার বিচারধারা অনুসরণ করেই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম হয় ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলায় মৌ-এ। তাঁর বাবা রামজি সকপাল তৎকালীন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থেকে দেশের সেবা করেন এবং ভাল ব্যবহার ও কর্মের জন্য তিনি সেনাবাহিনীর সুবেদার পদ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হন। ড. বি আর আম্বেদকরের মায়ের নাম ছিল ভীমাবাঈ। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রমাবাঈ। ১৯৩৫ সালে রমাবাঈ পরলোকগমন করেন।

রামজি প্রথম থেকেই নিজের ছেলেকে কঠোর পরিশ্রম এবং ভালভাবে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহিত করতেন। যার ফলে বি আর আম্বেদকর ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনাতে খুব ভাল ছিলেন। বি আর আম্বেদকর জাতিতে ছিলেন মাহার, যেই জাতিকে তৎকালীন ভারতের অস্পৃশ্য হিসেবে মানা হত। নিচু জাতির কোন মানুষ ভুল করে উঁচু জাতির মানুষের কোনও বস্তুকে স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হিসেবে মানা হত এবং সেই সমস্ত বস্তু মুছে উঁচু জাতির মানুষ পুনরায় ব্যবহার করতেন না। এমনকি সমাজের এইরকম খারাপ চিন্তা-ভাবনার জন্য নিচু জাতির মানুষ বিদ্যালয়ে ঠিকমত পড়াশোনা করতে পারত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে কর্মরত নিচু শ্রেণির মানুষদের জন্য আলাদা করে বিদ্যালয় তৈরি করেছিল এবং এর ফলে আম্বেদকর তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করতে পেরেছিলেন। বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় খুব ভাল হওয়া সত্ত্বেও আম্বেদকর ও তার সহপাঠী সমস্ত নিচু জাতির ছেলেকে বিদ্যালয় কক্ষের বাইরে বা কক্ষের যে-কোনও এক কোণায় আলাদাভাবে বসানো হত। এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তাদের প্রতি কোনও গুরুত্ব দিতেন না। নিচু জাতির হওয়ার জন্য তাদের অবহেলার চোখে দেখতেন। বিদ্যালয়ের নলকূপ থেকে জল খাওয়ার অধিকার পর্যন্ত তাদের ছিল না। বিদ্যালয়ের কেরানী এসে দূর থেকে তাদের হাতে জল ঢালতেন। কেরানী না থাকলে জল পান না করেই তাদের থাকতে হত। তৎকালীন ভারতের এরকম জটিল পরিস্থিতিতে নিচু জাতির কোনও ছেলেই বিদ্যালয়ে পড়তে চাইত না। বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অপমান ও অভদ্র ব্যবহারের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ত্যাগ করত।

১৮৯৪ সালে রামজি সকপাল ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পরিবারসমেত মহারাষ্ট্রের সাতারা গ্রামে চলে আসেন। সাতারা আসার দুই বছরের মধ্যে বি আর আম্বেদকরের মা ভীমাবাঈ মারা যান। এরপর তার পিসি মীরাবাঈ কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের দেখাশোনা করেন। রামজি সকপাল ও ভীমাবাঈয়ের ১৪ সন্তানের মধ্যে কেবলমাত্র তিন পুত্র বলরাম, আনন্দরাও ও ভীমরাও এবং তিন কন্যা মঞ্জুলা, গঙ্গা ও তুলসী এই কঠিন পরিস্থিতিতে জীবিত ছিলেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে কেবলমাত্র ভীমরাও আম্বেদকর সমাজের সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে পড়াশোনা করতে সফল হন। ১৮৯৭ সালে আম্বেদকর বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনিই ছিলেন প্রথম নিচু জাতির শিক্ষার্থী। ১৯০৭ সালে বি আর আম্বেদকর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করেন। এর ফলে তার স্বজাতির মানুষদের মধ্যে খুশির তরঙ্গ ছড়িয়ে যায়। কারণ সেই সময় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করা অনেক বড় ব্যাপার ছিল, তাও আবার নিচু জাতি থেকে। এই সাফল্যের জন্য অর্জুন কেলুস্কার বি আর আম্বেদকরকে তার নিজের লেখা গৌতম বুদ্ধের জীবনী প্রদান করেন।

এরপর বি আর আম্বেদকর সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ১৯১২ সালে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৩ সালে স্কলারশিপ পেয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন-এর জন্য তিনি আমেরিকা চলে যান। ১৯১৫ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯১৬ সালে একটি গবেষণার জন্য পিএইচ ডি লাভ করেন। পরে তাঁর গবেষণা 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় প্রাদেশিক অর্থনীতির উদ্ভব' নামে পুস্তক রূপে প্রকাশিত হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর তিনি ১৯১৬ সালে লন্ডনে চলে যান। সেখানে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এ আইন নিয়ে পড়াশোনা ও অর্থনীতির ওপর গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু পরের বছর স্কলারশিপের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় পড়াশোনা ও গবেষণা মাঝপথে থামিয়ে তিনি ভারতে আসতে বাধ্য হন। এরপর তিনি করণিক ও হিসাবরক্ষকের মত অনেক চাকরি করেন।

১৯২০ সালে জমানো টাকা এবং বন্ধুর সাহায্য নিয়ে পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ১৯২৩ সালে তাঁর গবেষণা 'রুপির সমস্যা' সম্পন্ন করেন। গবেষণার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত করে। এরপর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। দলিত শ্রেণির মানুষদের সামাজিক উন্নয়ন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যা তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২৬ সালে তিনি বোম্বাই বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৩৫ সালের ১৩ অক্টোবর বি আর আম্বেদকর সরকারি আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দু'বছর তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর ইন্ডেপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৫টি পদে জয় লাভ করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বিতর্কিত পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে একটি ছিল 'থট্‌স অন পাকিস্তান' যেখানে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। ড. আম্বেদকর ভারতবর্ষকে আলাদা নজরে দেখতেন। তিনি অবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষে যে সমস্ত নেতারা ছিল তাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বি আর আম্বেদকর ভারতবর্ষের প্রথম আইনমন্ত্রী হন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য নতুন আইন রচনা করেন, যা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তার বিচারধারা অনুসরণ করেই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

● নিজস্ব প্রদায়ক

ভারতবিষয়ক কুইজ

আচ্ছা, বলুন তো?

১. ভারতের প্রাচীনতম তেল-শোধনাগার কোন্‌টি?
ক. গৌহটি
খ. বরুণী
গ. ম্যাঙ্গালোর
ঘ. ডিগবয়

২. কোন্‌টি ভারতের সর্বোচ্চ ধান উৎপাদনকারী রাজ্য?
ক. পশ্চিমবঙ্গ
খ. অন্ধ্রপ্রদেশ
গ. পঞ্জাব
ঘ. উত্তর প্রদেশ

৩. কোন্‌টি ভারতের সর্বোচ্চ তুলা উৎপাদনকারী রাজ্য?
ক. মধ্যপ্রদেশ
খ. গুজরাট
গ. তামিলনাড়ু
ঘ. হরিয়ানা

৪. ভারতের প্রথম প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
ক. কর্নাটক
খ. কেরালা
গ. উত্তর প্রদেশ
ঘ. হরিয়ানা

৫. রাজীব গান্ধী জাতীয় যুব উন্নয়ন সংস্থা কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?
ক. তামিলনাড়ু
খ. কর্নাটক
গ. হিমাচল প্রদেশ
ঘ. উত্তরাঞ্চল

৬. ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালা কোন্‌টি?
ক. হিমালয়
খ. আরাবল্লি
গ. স্তরূপা
ঘ. নীলগিরি

৭. ভারতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন্‌টি?
ক. এভারেস্ট
খ. নন্দা দেবী
গ. কাঞ্চনজঙ্ঘা
ঘ. যমুনত্রী

৮. দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি?
ক. কাবেরী
খ. কৃষ্ণা
গ. বৈগাই
ঘ. গোদাবরী

৯. ভারতের দীর্ঘতম রেলওয়ে সুড়ঙ্গ কোন্‌টি?
ক. কুরবুড়ে
খ. কারওয়ার
গ. পীর পঞ্জল
ঘ. খোয়াই

১০. কোন্ শহরে ভারতের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার অবস্থিত?
ক. মুম্বই
খ. পুণে
গ. চেন্নাই
ঘ. হায়দ্রাবাদ

১১. জীবন্ত শিকড়সেতু কোন্ রাজ্যে দেখা যায়?
ক. অসম
খ. মিজোরাম
গ. সিকিম
ঘ. মেঘালয়

১২. কোন্‌টি ভারতের বৃহত্তম জুলজিক্যাল পার্ক?
ক. অবিগনর জুলজিক্যাল পার্ক, চেন্নাই
খ. নন্দনকানন জুলজিক্যাল পার্ক, ভুবনেশ্বর
গ. নেহরু জুলজিক্যাল পার্ক, হায়দ্রাবাদ
ঘ. মহীশূর জু, মহীশূর

১৩. ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম ও এশিয়া মৌলিনং কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?
ক. অরুণাচল প্রদেশ
খ. মণিপুর
গ. মেঘালয়
ঘ. নাগাল্যান্ড

১৪. ভারতের রেলওয়ে সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
ক. দিল্লি
খ. কলকাতা
গ. পুণে
ঘ. মুম্বই

১৫. ভারতের কোন্ নারী প্রথম হিমালয় পর্বতারোহণ করেন?
ক. প্রেমলতা আগরওয়াল
খ. অরুণিমা সিনহা
গ. বাচেন্দ্রী পাল
ঘ. কৃষ্ণা পাতিল

১৬. ভারতের কোন্ নারী কৃত্রিম পা নিয়ে প্রথম হিমালয় পর্বতারোহণ করেন?
ক. প্রেমলতা আগরওয়াল
খ. অরুণিমা সিনহা
গ. বাচেন্দ্রী পাল
ঘ. কৃষ্ণা পাতিল

১৭. কাকে ভারতের পক্ষিমানব বলা হয়?
ক. হুমায়ুন আবদুল আলি
খ. সলিম আলি
গ. বিশ্বময় বিশ্বাস
ঘ. পূর্ণচন্দ্র তেজস্বী

১৮. কোন্ ভারতীয় প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন?
ক. জামশেদজী টাটা
খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. দাদাভাই নওরোজি
ঘ. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

১৯. 'ওনাম' প্রধানত কোন্ রাজ্যে উদ্‌যাপিত হয়?
ক. কেরালা
খ. তামিলনাড়ু
গ. কর্নাটক
ঘ. ওড়িশা

২০. মহারাষ্ট্রের অজন্তা গুহাপুঞ্জে গুহার সংখ্যা কত?
ক. ৪১
খ. ৩৩
গ. ২১
ঘ. ৩০

২১. মহারাষ্ট্রের ইলোরা গুহাপুঞ্জে গুহার সংখ্যা কত?
ক. ২০
খ. ৩৪
গ. ৩১
ঘ. ১১

২২. কত বছর পর পর একই জায়গায় মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ৩
খ. ৫
গ. ৬
ঘ. ১২

২৩. কোন্ শহরে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না?
ক. বেনারস
খ. হরিদ্বার
গ. নসিক
ঘ. উজ্জয়িন

২৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন কতদিন চলতে পারে?
ক. একদিন
খ. দুইদিন
গ. তিনদিন
ঘ. চারদিন

২৫. অশোকচক্রে স্পোকের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১৮
খ. ২৪
গ. ২৬
ঘ. ১২

[উত্তর শেষ পাতায়]

শেষ পাতা

ছায়াবাদের ‘মীরা’ মহাদেবী বর্মা

হিন্দি সাহিত্যের মহান সুপরিচিত কবি ও লেখক মহাদেবী বর্মা তাঁর রচনায়-কাব্যে-গদ্যে শব্দের ব্যবহার এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল রচনার গঠন-কাঠামো। তিনি আধুনিক হিন্দি কাব্যধারার ‘ছায়াবাদ’ ঘরানার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, সেই কারণে তাঁকে ছায়াবাদের ‘মীরা’ও বলা হত। যদিও তিনি ছায়াবাদ ঘরানায় সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, জয়শঙ্কর প্রসাদ ও সুমিত্রানন্দন পন্তের চেয়ে অনেক পরে এসেছেন, তবে তাঁর লেখার ধরন ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। তাঁর কবিতায় রহস্য ছিল, ছিল অজানার প্রতি আভাস।

তাঁর রচনায় দুঃখ ও ভালবাসা এমনভাবে মিশে আছে যা আলাদা করা যায় না। তাঁর রচিত কবিতা ও গদ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মেরা পরিবার, স্মৃতি কি রেখাঁ, পথ কে সাথী ও অতীত কে চলচ্চিত্র।

আনন্দের উৎসব রঙের উৎসব হোলির দিনে ১৯০৭ সালের ২৬ মার্চ হোলির দিনে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাত সন্তানের পর এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। পিতামহ বঙ্কুবিহারী গৃহদেবতার নামে নাতনির নামকরণ করেন মহাদেবী। তাঁর বাবা গোবিন্দপ্রসাদ বর্মা ছিলেন ভাগলপুরের একটি কলেজের অধ্যক্ষ। মা হেমরানি দেবী ছিলেন গৃহবধূ। মহাদেবীর সাত বছর বয়সে একদিন কিছু লিখছেন দেখে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী লিখছ তুমি?’ মহাদেবী উত্তর দিলেন, ‘আমি কবিতা লিখছি।’ মহাদেবী তাঁর বাবাকে কবিতাটি পড়ে শোনান।

খুব অল্প বয়সে মহাদেবী বর্মার বিয়ে হয়, কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে আজীবন সন্ন্যাসী হয়ে অতিবাহিত করেন। মহাদেবীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় ইন্দোরের মিশন স্কুলে। এর পাশাপাশি বাড়িতেও তাঁর সংস্কৃত, ইংরেজি, সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ১৯১৯ সালে এলাহাবাদের ক্রস্টওয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় মহাদেবী প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এসময় থেকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যায়ে

আচ্ছা, বলুন তো?

উত্তর:

১.ঘ, ২.ক, ৩.খ, ৪.ঘ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. গ, ৮. ঘ, ৯. গ, ১০.ঘ, ১১. ঘ, ১২. ক, ১৩. গ, ১৪. ক, ১৫.গ, ১৬. খ, ১৭.খ, ১৮. গ, ১৯. ক, ২০. ঘ, ২১.খ, ২২. ঘ, ২৩. ক, ২৪. গ, ২৫.খ

তিনি সফল কবি হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। কলেজে সুভদ্রা কুমারী চৌহানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সুভদ্রা কুমারী চৌহান মহাদেবীর হাত ধরে তার বন্ধুদের মাঝে নিয়ে গিয়ে বলতেন, ‘শোন, ইনিও কবিতা লেখেন।’ ১৯৩২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সংস্কৃতে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তাঁর ‘নীহার’ ও ‘রশ্মি’ নামে দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। মহাদেবী লেখা, সম্পাদনা ও শিক্ষকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের ‘প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠে’ দীর্ঘ সময় অধ্যক্ষা ও উপাচার্য ছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ‘নীহার’ (১৯৩০) ও ‘রশ্মি’ (১৯৩২) ছাড়াও ১৯৩৪ সালে তাঁর ‘নীরজা’ ও ‘সন্ধ্যাগীত’ নামে আরও দু’টি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এই চারটি কবিতার সংকলন ১৯৩৯ সালে একত্রে ‘যম’ নামে প্রকাশিত হয়। তিনি গদ্য, কবিতা, শিক্ষা ও চিত্রকলায় নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর অন্য কবিতা ও গদ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মেরা পরিবার, স্মৃতি কি রেখাঁ, পথ কে সাথী ও অতীত কে চলচ্চিত্র। তাঁকে হিন্দি সাহিত্যে রহস্যবাদের পথিকৃৎ হিসেবেও গণ্য করা হয়।

মহাদেবীর উপর বৌদ্ধধর্মের গভীর প্রভাব ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে জনসেবায় ব্রতী হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। মহাদেবী ১৯৩৬ সালে নৈনিতাল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে রামগড় অঞ্চলের উমাগড় গ্রামে মীরা মন্দির নামে একটি বাংলো তৈরি করেন। সেখানে বসবাসকালে তিনি গ্রামের শিক্ষা ও উন্নয়নকাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে এই বাংলোটির নাম দেওয়া হয় ‘মহাদেবী সাহিত্য সংগ্রহালয়’। ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি এলাহাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

● নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল :

ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন: ১২৩৯

inf4.dhaka@mea.gov.in

ড. সনজিদা খাতুনকে পদ্মশ্রী পুরস্কার হস্তান্তর

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের পক্ষে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী ড. সনজিদা খাতুনকে শিল্পকলায় তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার হস্তান্তর করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ২১ নভেম্বর ২০২১ ভারতে অনুষ্ঠিক পুরস্কার বিতরণীতে অংশ নিতে পারেননি। দেশের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও ১৯৭১সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সনজিদা খাতুন বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি একান্ত নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ছায়ানটেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী ড. সনজিদা খাতুনকে স্মারক দিয়ে অভিনন্দন জানান, যা মৈত্রী দিবসে ২০২০ ও ২০২১ সালের পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের দেয়া হয়েছিল

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে কমোডিটি এক্স সহযোগিতা

১২ এপ্রিল ২০২২ এমসিএক্স বাংলাদেশে প্রথম কমোডিটি এক্স প্রতিষ্ঠা করতে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে এক পরামর্শ চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী ও ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম কে. দোরাইস্বামী স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন

নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ও আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির প্রসার!

১১-১২ এপ্রিল ২০২২-এ আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অসমের ডিব্রুগড়ে নৌ চলাচলবিষয়ক এক জলপথ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি, মন্ত্রী সর্বানন্দ সনওয়াল, মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মন্ত্রী জি কৃষ্ণ রেড্ডি, বীমার রঞ্জন রাজকুমার, বাংলাদেশের নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, অর্থনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক মন্ত্রী লিয়নপো লোকনাথ শর্মা বক্তব্য রাখেন। এতদঞ্চলে দক্ষ জলপথ বাস্তুতন্ত্রের বিকাশের ওপর গুরুত্বপ্রদান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থান বেগবান করতে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, April, 2022

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সাথে কোনও এজেন্টের সম্পর্ক নেই, বা আমরা ছবিতে উল্লেখিত এজেন্টদের কাছ থেকে কোনও পরিষেবা নিই না। ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশী নাগরিকদের কাছ থেকে কোনও ভিসা ফি নেয় না। ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হোন।

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka